রাহাতুল মুহিব্বীন

প্রেমিকদের শান্তি

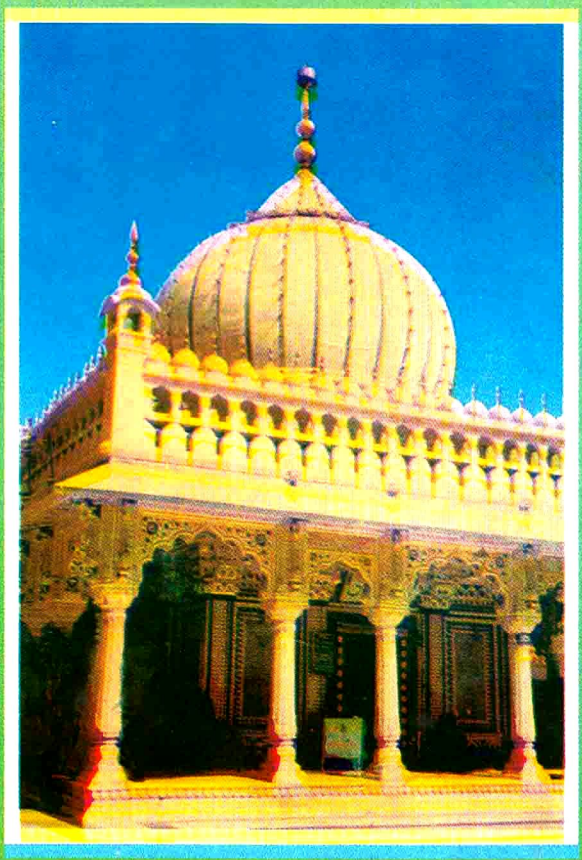

কথা ঃ

হযরত মাহবুবে রব্বানী

খাজা নিজামউদ্দিন আওলিয়া (রহঃ)

আল্লাহ তায়ালার বন্ধুদের শানে

কোরান শরীফ ও হাদীস শরীফের কয়েকটি বাণী ঃ

- ফাস আলুকা আহ্লাজ জিকরি ইনকুনতুম লা তালামুন।

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা বলে, তোমরা যা না জান, জেকেরকারিগণকে জিজ্ঞেস কর।

- ইন্নানি আনাল্লাহু লা-ই-লাহা ইল্লা ফাবুদুনি ওয়া আকিমুছ ছালাতা লিজিকরি।
  – সূরা ত্বোয়াহা : ১৪ আয়াত

অর্থ ঃ আমিই আল্লাহ, আমা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার জিকিরের জন্য সালাত কায়েম কর।

- আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ্ লা খাওফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম লা ইয়াহ্ জানুন।
  – সূরা ইউনুস : ৬২ আয়াত

অর্থ ঃ সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহ ওলীদের (বন্ধুদের) কোর ভয় নেই এবং তাদের কোন দুঃখ ভাবনা নেই।

- ইন্না আউলিয়া আল্লাহু লা ইয়ামুতুন বাল ইয়ানতাকিলু মিন দারুল ফানা ইলা দারুল বাকা। – আল হাদীস

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোন মৃত্যু নেই বরং তাঁরা স্থানান্তরিত হয় ধ্বংসশীল ইহ জগৎ হতে স্থায়ী পরজগতে।

- আল্ আউলিয়াও রায়হানুল্লাহ। – আল হাদীস

অর্থ ঃ আউলিয়া আল্লাহর সুবাস।

- কারামাতুল আউলিয়াউন হাক্কুন। – আল হাদীস

অর্থ ঃ আউলিয়া এর অলৌকিক ক্ষমতা সত্য।

- ইন্না আউলিয়াই তাহ্তা কাবাই লা ইয়ারিফুহুম গায়রী ইল্লা আউলিয়াই।
  – হাদীসে কুদ্সী

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমার বন্ধুগণ আমার জুব্বার অন্তরালে অবস্থান করেন, আমি ভিন্ন তাঁদের পরিচিতি সম্বন্ধে কেহই অবহিত নহে, আমার আউলিয়া ব্যতীত।

- কুলবুল ইনসানি বাইতুর রহমান ওয়া কুলবুল মুমিনিনা আরশুল্লাহ।
  – আল হাদীস

অর্থ ঃ মানুষের হৃদয় আল্লাহর ঘর এবং মুমিনের হৃদয় আল্লাহর সিংহাসন।

- কুলবুল মুমিনিনা মিরআতুল্লাহ।
  – হাদীসে কুদ্সী

অর্থ ঃ মুমিনের হৃদয় আল্লাহ্র দর্পণ।



রশীদ বুক হাউস

৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৯১৩৪৯৩৩১১

রাহাতুল মুহিব্বীন

[প্রেমিকের শান্তি]

অমীয় বাণী ঃ

হযরত মাহবুবে রব্বানী

খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি

কলমবন্দী করেছেন ঃ

হযরত খাজা আমীর খসরু রহমতুল্লাহি আলাইহি

অনুবাদক

কফিলউদ্দিন আহ্‌মদ চিশ্‌তী

রশীদ বুক হাউস

৬ প্যারীদাস রোড

বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।

হযরত খাজা গরীব নওয়াজ-এর ৭৯১তম উরস উদযাপন

উপলক্ষে ২য় প্রকাশ

প্রকাশনায় ঃ
চিশ্‌তী আফজাল-উন-নিছা
চিশ্‌তীয়া পাবলিকেশান্স
ট-৭৬/২, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা।

প্রকাশকাল ঃ
১লা রজব, ১৪২৫ হিজরী
১৮ই আগস্ট, ২০০৪

সর্বস্বত্ব ঃ অনুবাদকের

ডিজাইন ঃ শাকিল আহ্‌মেদ চিশ্‌তী

গ্রাফিক্স ঃ ফেরদৌস আহ্‌মেদ
বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার মার্কেট (৪র্থ তলা)
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিরিশদাস লেন
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ জবা কম্পিউটার
বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার মার্কেট (৪র্থ তলা)
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সহযোগিতায় ঃ
আশফাক আহ্‌মেদ চিশ্‌তী, রোখসানা আহ্‌মেদ চিশ্‌তী
জামিল আহ্‌মেদ চিশ্‌তী, শাকিল আহ্‌মেদ চিশ্‌তী

মূল্য ঃ ১৫০.০০ টাকা

RAHATUL MUHIBBIN
By Hazral Khawja NASIRUDDIN MAHMOOD (R.A)
PRICE : Taka One hundred Only.

উৎসর্গ

খাজায়ে খাজেগান
কুতুবে রব্বানী
গাওসে সামদানী
বাদশাহে হিন্দ
রওশন জমির
কুতুবুল মাশায়েখ
মুরাদিল মুস্তাকিন
সিরাজুস্ সালেকিন

পীরে পীরান
মাহ্বুবে সোবহানী
সুলতানুল আউলিয়া
চিরাগে চিশ্তীয়া
আতায়ে রসুল
রাহাতিল আশেকীন
সামসিল আরেফীন
বুরহানুল আশেকীন

হযরত খাজা গরীব নওয়াজ,
শায়খ সৈয়দ মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্তি সন্জরী
ছুম্মা আজমেরী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু-এর
পবিত্র কর কমলে

প্রাপ্তিস্থান

বারগাহে চিশ্‌তীয়া, ট-৭৬/২, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা।
বাংলা মিল স্টোরস, ২২৬ নবাবপুর রোড, ঢাকা।
চিশ্‌তীয়া হাউস
বাড়ী # ১১, রোড # ২ ব্লক # ই
বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা–১২১৯
নজরুল হোমিও হল, ৩/৩-এ, বিজয় নগর, ঢাকা।
ফারুক হোমিও হল, ২০৯ শান্তিবাগ, ঢাকা।
হক লাইব্রেরী, বায়তুল মুকাররম বই মার্কেট, ঢাকা।
গাউসুল আজম জামে মসজিদ, শাহজাহানপুর, ঢাকা।
আমিনবাগ জামে মসজিদ, শান্তি নগর, ঢাকা।
মুহাম্মদী কুতুবখানা, ৪২, জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

আমাদের প্রকাশিত কিতাবসমূহ

(১) আনিসুল আরওয়া—কথা ঃ হযরত খাজা ওসমান হারূনী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(২) দলিলুল আরেফীন—কথা ঃ খাজা গরীব নওয়াজ মুঈনুদ্দীন হাসান চিশ্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(৩) ফাওয়ায়েদুস্ সালেকীন—কথা ঃ হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(৪) রাহাতুল মুহেব্বীন—কথা ঃ হযরত খাজা শায়খ ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(৫) রাহাতুল কুলুব—কথা ঃ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(৬) ফাওয়ায়েদুল ফাওয়াদ—কথা ঃ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(৭) খায়রুল মাজালিস আপনাদের কর কমলে পেশ করছি।

(৮) রুহে তাসাউওফ—কথা ঃ সৈয়দ মুহাম্মদ গেসু দারাজ বান্দা নওয়াজ রহমতুল্লাহি আলাইহি। (যন্ত্রস্ত)

পুস্তক পরিচিতি

রাহাতুল মুবিব্বীন

পুস্তকটি প্রথম প্রকাশ
৭ম হিজরীতে ফার্সী ভাষায়।
এ উপমহাদেশের প্রখ্যাত ও শ্রদ্ধেয়, অলিকুল
শিরমনি, হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহি
আলাইহি -এর দরবারে আলোচিত ১৭টি মজলিস
ধারণ করে রয়েছে-এ পুস্তক। এ কিতাবটির অন্য আর
একটি বিশেষ পরিচয় হচ্ছে মকতুবাতে খাজেগানে চিশ্‌ত এর
হাস্ত মকতুবের এটি পঞ্চম কিতাব। হযরত খাজা নিজামুদ্দিন
রহমতুল্লাহি আলাইহির মজলিসে আলোচিত বিষয়গুলো
খাজা সাহেবের স্নেহভাজন মুরিদ উপমহাদেশের
প্রখ্যাত কবি ও লেখক হযরত খাজা আমির
খসরু রহমতুল্লাহি আলাইহি যিনি
লিপিবদ্ধ করে পুস্তকাকারে
বের করেন ৭০০
হিজরীতে।

অনুবাদকের কথা

অনাদ্যন্ত সদা বিদ্যমান পরম করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ জাল্লে শানহু-র অফুরন্ত ও অবারিত দয়ায় খাজেগান-এ চিশ্‌ত রাদিয়াল্লাহু আনহুর দ্বারা বিরচিত বিভিন্ন মজলিশে আলোচিত কথামালার পঞ্চম পুস্তক রাহাতুল মুহিব্বীন (প্রেমিকদের শান্তি)-এর অনুবাদ করতে পেরে মহামহিমের দরবারে পেশ করছি শুকরিয়া সেজদা।

অনুবাদে কর্মের ধারা ও পদ্ধতি বিভিন্ন ভাবে অনুসরণ করে থাকেন বিভিন্ন জন। আমি অনভিজ্ঞ গোনাহ্‌গার খাজেগান-এ চিশ্‌ত রহমতুল্লাহি আলাইহিদের নিকৃষ্ট গোলাম আদি কিতাবের প্রতিটি লাইন ও শব্দ ঠিক যেমনি আছে তেমনি ভাবে অনুবাদ করেছি। কোন শব্দকে যেমন বাদ দেইনি তেমনি কোন শব্দ নতুনভাবে সংযোজনও করিনি। এর কারণে কোথাও কোথাও বাংলায় অনুবাদ খাপছাড়া মনে হলেও আমার কিছু করার নেই। আশা করছি সুধী পাঠক সমাজ ক্ষমা সুন্দর হৃদয়ে পুস্তকটি গ্রহণ করবেন এবং উপকৃত হলে দোয়া করবেন।

—অনুবাদক

প্রকাশিকার কথা

আমরা পাঠক বৃন্দকে প্রতিশ্রুত দিয়েছিলাম মালফুজাতে খাজেগান-এ-চিশ্‌ত-এর আটটি কিতাব উপহার দেয়ার। প্রতিশ্রুত কিতাবগুলোর ৫ম কিতাব **'রাহাতুল মুহিব্বীন'**-এর প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে অনেক আগে। কিন্তু সময় মতো আমরা পাঠকদের নিকট এর দ্বিতীয় সংস্করণ পেশ করতে পারিনি বলে দুঃখিত। কিন্তু দেরীতে হলেও এর দ্বিতীয় সংস্করণ আপনাদের সম্মুখে পেশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

এ দীর্ঘ সময় ধরে বহু পাঠক ব্যক্তিগতভাবে এবং বহু পাঠক চিঠির মাধ্যমে রাহাতুল মুহিব্বীনের দ্বিতীয় সংস্করণের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। তাদের কষ্ট স্বীকার করার জন্য আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের খেদমতে পেশ করছি রাহাতুল মুহিব্বীনের দ্বিতীয় সংস্করণ।

এবার চিশ্‌তিয়া খান্দানের মালফুজাতে-এ-চিশত-এর ৭ম কিতাব 'হযরত খাজা নাছির উদ্দীন মাহ্‌মুদ চিরাগ-ই দেহ্‌লী বিরচিত **'খাইরুল মাজালিশ'**ও আশেক পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করা হলো।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবাঞ্ছিত কারণে এ পুস্তকে বহু রকমের ভুল ত্রুটি থেকে যেতে পারে যা পুনঃ মুদ্রণ ব্যতীত শুদ্ধ সম্ভব নয়। অতএব সূধী পাঠকবৃন্দ তাদের ক্ষমা সুন্দর হৃদয়ে পুস্তকটি গ্রহণ করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

সূচী পত্র

প্রথম মজলিস

ক) আল্লাহ তায়ালার বালা মছিবতের খাজাঞ্চি খানা এবং তার প্রয়োগ।

খ) ১। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর দেহ তৈরী

২। বেহেস্তে স্থানান্তর

৩। হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে ইবলিস সেজদা না করার পরিণতি।

দ্বিতীয় মজলিস

ক) হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম-এর নৌকা প্রস্তুত।

খ) নৌকার প্রতিটি তক্তায় ১,২৪,০০০ পয়গম্বরের নাম সন্নিবেশিত।

গ) চার খলিফা ও পাক পাঞ্জাতন নামাঙ্কিত তক্তা।

ঘ) হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম-এর নৌকায় তাঁর উম্মতের স্থান ও সেই সাথে শয়তানকে আশ্রয় দান।

ঙ) যে নামাযে মনোস্কামনা পূর্ণ হয় সেই নামাজের নাম নামাজে ওয়াইস করনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তা পড়িবার নিয়ম।

চ) মোমিনের সালাতে আল্লাহর দ্বীদার লাভ হওয়ার কুরানিক ও হাদিসের সুস্পষ্ট দলীল।

তৃতীয় মজলিস

ক) হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম বাল্য কালে মূর্তির গলায় রশি দিয়ে বাজারে নিতেন এবং বিক্রি করতেন।

খ) তাঁর ঐশি প্রেমের গভীরতার নমুনা।

গ) নমরুদের বিশাল অগ্নিকুন্ড প্রস্তুত এবং তন্মধ্যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামকে নিক্ষেপ।

ঘ) ল্যাংড়া মশা কর্তৃক নমরুদের প্রাণবধ।

ঙ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম-এর মোহরে নবুওয়াতের বিশেষ ঘটনা।

চতুর্থ মজলিস

ক) চিরঞ্জীব নবীদের ঘটনাবলী

১। হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম

২। হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালাম

৩। হযরত খিজির আলাইহিস সালাম

৪। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম

পঞ্চম মজলিস

ক) পবিত্র রমজান মাস আল্লাহ তায়ালার রহমতের বিশেষ পরিচিতি বহন করে।

খ) রমজান মাসের হযরত ওসমান হারুনী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

গ) হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে তাঁর পিতা-মাতা ও ভ্রাতৃগণ অদূর ভবিষ্যতে সেজদা করবে তার পূর্বাভাস।

ঘ) ১। প্রতিহিংসা পরায়ণ ভ্রাতৃগণ কর্তৃক হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে অন্ধ কূপে নিক্ষেপ।

২। ফেরেস্তা কর্তৃক নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর।

৩। সওদাগর কর্তৃক কূপ হতে উত্তোলন।

৪। ভ্রাতৃগণ কর্তৃক সওদাগরদের নিকট দাস রূপে বিক্রয়।

৫। কৃতদাস রূপে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম মিশরের বাজারে বাদশাহের নিকট বিক্রয়।

৮। পুত্র শোকে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম-এর অন্ধত্ববরণ।

৭। অনিন্দ ও অপরূপ সৌন্দর্য্যের মনোহারিত্যের অধিকারী হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম-এর একবার দর্শনে ৭ দিনের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ।

ষষ্ঠ মজলিস

ক) হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালামকে তাঁর উম্মতগণ করাত দ্বারা দ্বিখন্ডিত করণের বিবরণ।

খ) আল্লাহর বন্ধুত্বের প্রেম-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

গ) তরিকতের পথে কামেল বীর পুরুষ ও অর্দ্ধ কামেলদের পরিচয়।

সপ্তম মজলিস

ক) হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম-এর প্রেম-পরীক্ষা ও স্বেচ্ছায় বালা (দুঃখ-দূর্দশা) গ্রহণ।

খ) ২২ বছর আল্লাহর প্রেমে দুনিয়াদারী ত্যাগপূর্বক গহীন জংগলে আল্লাহ্র ধ্যানে নিমগ্ন।

গ) বালা হতে নাযাতের বিচিত্র ঘটনা।

ঘ) সুললিত মনোমুগ্ধকর চুম্বকার্ষিতরূপি কণ্ঠের অধিকারী দাউদ আলাইহিস্ সালাম-এর অনন্যরূপ।

ঙ) ভাসমান ও দ্রুতযান রূপে 'তখতে সোলায়মান' বা হযরত সোলায়মান আলাইহিস্ সালাম-এর সিংহাসন।

অষ্টম মজলিস

ক) ফেরাউনের স্বপ্ন এবং হযরত মুছা আলাইহিস্ সালাম-এর জন্ম।

খ) নবী দেহ আগুণ স্পর্শ না করার আর একটি উদাহরণ।

নবম মজলিস

ক) হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর ঘটনা ঃ

১। পিতাছাড়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ।

২। জন্মলগ্ন থেকেই বাক্যালাপ।

৩। আল্লাহর প্রেমের বিশেষ নিদর্শন।

খ) হযরত খিজির আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক সুলুকের পথের পথিকদেরকে সাহায্য দান।

দশম মজলিস

ক) হযরত লূৎ আলাইহিস্ সালাম-এর উম্মতদের দশটি বদ অভ্যাসের বিবরণ।

একাদশ মজলিস

ক) সফর মাসে ১,২০,০০০ বালা নাজেল হওয়ার বিবরণ।

খ) সুলুকের পথে সালেকের পরিচয়।

গ) হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র পদ চুম্বনের এক বিস্ময়কর ঘটনা।

দ্বাদশ মজলিস

ক) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মলগ্নের কিছু লুক্কায়িত ঘটনার উদঘাটন।

খ) তরিকতে পিতা-মাতার আনুগত্যের বিশেষ দিক।

ত্রয়োদশ মজলিস

ক) বিভিন্ন তরিকায় তরিকত পন্থিদের জন্য স্তর ও স্তরসমূহের সংখ্যার বিবরণ।

খ) চিশ্‌তীয়া তরিকার শ্রেষ্ঠত্ব।

গ) প্রকৃত ইসলাম ও প্রকৃত মুসলমানের পরিচয়।

চতুর্দশ মজলিস

ক) মাওলার নূরের রহস্য ও কুল্লাহ চাহার তরকীর (চিশ্‌তীয়া তরিকার জন্য চার খন্ডে প্রস্তুত বিশেষ ধরণের টুপি) আলোচনা।

পঞ্চদশ মজলিস

ক) দরূদ শরীফের ফজিলতের বিশেষ রূপ।

খ) বয়াত বা মুরিদ করার যোগ্য পীরের পরিচিতি।

ষোড়শ মজলিস

রমজান মাসের ফজিলত এবং আউলিয়াদের কারামত।

সপ্তদশ মজলিম

মহর্‌রম মাসের ফজিলত এবং আশুরার তাৎপর্য।

—o—

হযরত মাহ্‌বুবে ইলাহি খা'জা নিজামউদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

সুলতানুল আউলিয়া ওয়াল মাশায়েখ, ফখরুল আশেকীন, মাহ্‌বুবে রাব্বুল আলামিন নিজাম-উল-হক ওয়াশ শারাহ্ ওয়াদ্-দ্বীন মুহাম্মদ ইবনে আহ্‌মদ বাদাউনী বোখারী ছুম্মা দেহ্‌লবী নূরুল্লাহ্ 'মর্‌কাদাহু'র বংশ অষ্টাদশ পুরুষে হযরত ইমামুল আরদে ফিস্ সামায়ে সুলতানুশ্ শোহ্‌দা হযরত ইমাম হুসাইনুশ্ শহীদ ফিল্ কারবালা রাদিআল্লাহু আনহু পর্যন্ত পৌঁছেছে।

হযরত মাহ্‌বুবে এলাহি খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহঃ)

তাঁর পিতা ঃ সৈয়দ খা'জা আহ্‌মদ
তাঁর পিতা ঃ সৈয়দ খা'জা আলী হোসাইনী আল বোখারী
তাঁর পিতা ঃ সৈয়দ খা'জা আব্দুল্লাহ্
তাঁর পিতা ঃ সৈয়দ খা'জা হাছান
তাঁর পিতা ঃ সৈয়দ খা'জা মীর আলী
তাঁর পিতা ঃ সৈয়দ খা'জা মীর আহ্‌মদ
তাঁর পিতা ঃ সৈয়দ খা'জা মীর আবি আব্দুল্লাহ্
তাঁর পিতা ঃ সৈয়দ খা'জা মীর আলী আসগর
তাঁর পিতা ঃ সৈয়দ খা'জা জা'ফর
তাঁর পিতা ঃ সৈয়দ খা'জা আলীউল ইমাম
তাঁর পিতা ঃ সৈয়দ খা'জা আলীউল হাদী আত্‌তাকী
তাঁর পিতা ঃ সৈয়দ খা'জা ইমাম মুহাম্মদ আল্ যোয়াদ
তাঁর পিতা ঃ আল ইমামুশ্ শোহ্‌দা হযরত ইমাম আলী মোসা রেজা
তাঁর পিতা ঃ আল্ ইমাম মোসা আল কাজেম আল গায়ীজ
তাঁর পিতা ঃ আল ইমামুল হিমাম হযরত জা'ফর সাদেক
তাঁর পিতা ঃ আল ইমামুল মুহাম্মদ আল বাকের
তাঁর পিতা ঃ আল ইমাম আলা হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন
তাঁর পিতা ঃ আল ইমাম ফিল আরদে ওয়াস্ সামায়ে সুলতানুশ শোহ্‌দা হযরত ইমাম হুসাইনুশ শহীদ ফিল কারবালা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুম আয্‌মাইন।

তাঁর মায়ের বংশও হযরত ইমাম হুসাইন রাদিআল্লাহ তায়ালা আনহুর সাথে সংযুক্ত রয়েছে। চতুর্থ পুরুষের পর পিতা-মাতার বংশ তালিকা অভিন্ন।

তাঁর পবিত্র মায়ের নাম বিবি জোলায়খা রহমতুল্লাহি আলাইহি

বিন্‌তে

হযরত সৈয়দ খাজা আরব আল হোসায়নী আল বোখারী

বিন্‌

হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ

বিন্‌

হযরত সৈয়দ হাসান রহমতুল্লাহ আলাইহি

এবং এখান থেকেই পিতা-মাতার বংশ তালিকা এক।

হযরত খা'জা নিজামউদ্দীন রহমতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন সুলতানুল মাশায়েখ হরিকুল মুহাব্বাত হযরত খাজা ফরিউদ্দীন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রধান খলিফা। কুত্‌বে সায়ের গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তাঁর দাদা খা'জা সৈয়দ আলী বোখারী এবং নানা খা'জা আরব রহমতুল্লাহি আলাইহি বোখারা হতে হিন্দুস্তানে আগমন করেন এবং বর্তমান পাকিস্তানের লাহোরে কিছুদিন থাকার পর সে সময়ের ইসলামের প্রাণকেন্দ্র বাদাউন শহরে বসবাস করতে থাকেন। এ সময় হযরত খা'জা আলী রহমতুল্লাহি আলাইহি এর সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছেলে খা'জা আহমদ রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং হযরত খা'জা আরব রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যা রাবেয়া উসর বিবি জোলায়খা রহমতুল্লাহি আলাইহি। পরবর্তী সময়ে উভয় ভ্রাতার ইচ্ছায় অর্থাৎ হযরত খা'জা আলীর ছেলে আহ্‌মদ ও খা'জা আরবের মেয়ে বিবি জোলায়খার সঙ্গে বিবাহ কার্য সম্পাদন হয় এবং এ দু' পবিত্র আত্মার মাধ্যেমেই আগমন ঘটে হযরত মাহবুবে ইলাহি খা'জা নিজামউদ্দিন রহমতুল্লাহ্ আলাইহির। শায়খ মুসলেহ্ উদ্দিন সাদী সিরাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

آفرین از خدائے بر پدرے

کہ ازو ماند اینچنین پسرے

وللہ در لمن قال -

বাংলায় উচ্চারণ ঃ আফ্‌রী আয্ খোদায়ে বর পিদরে
কে আয্ ও মানাদ ইঁ চুনিন পিস্‌রে
ওয়াল্লাহ্ দুর্‌রুন লেমান কালা

বাংলা অর্থ ঃ খোদা হতে উৎপাদিত পিতার মাঝে
স্থান নিয়ে ছিলো যে আকর্ষিত হয়ে
হায় আল্লাহ এ যেন এক মতি অমূল্য।

پدرے راکه انچنان خلف است
مادرے راکه اینچنین پسر است
افتابش براستین قباست
ما هتابش براستان درست

বাংলায় উচ্চারণ ঃ পিদরে রা কে আঁচুনানে খলফে আস্ত
মাদরে রা কে ইঁ চুনিঁ পেসার আস্ত
আফতাবাশ বর আসতিন কাবা আস্ত
মাহ্‌তাবাশ বর আসতাঁ দুরস্ত

বাংলায় অর্থ ঃ পিতাহতে ওয়ারিশী যা কিছু তাঁর,
মাতাহতেও টেনে নিল সে দুর্বার।
সূর্যরশ্মি চম্‌কায় যেমন তার আস্তানায়
চন্দ্রকিরণও পবিত্র কুটীরে উজ্জ্বল তেমন।

শিশু বয়সে হযরত খা'জা নিজামউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পিতাকে হারান। পিতার এন্তেকালের পর দাদা হযরত সৈয়্যদ আহ্‌মদ রহমতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট তিনি প্রতিপালিত হতে থাকেন। কিন্তু সে সৌভাগ্যও তিনি বেশী দিন ভোগ করতে পারেন নি। কারণ তিনিও অচিরেই পরপারের ডাকে সাড়া দিয়ে দুনিয়া হতে বিদায় নিলেন। এমন বিপদের সময় তাঁর মা শক্ত হাতে হাল ধরে পুত্রের যাবতীয় ব্যয়ভার স্বীয় পারিশ্রমিক দ্বারা নির্বাহ করতে লাগলেন। যখন তাঁর বয়স ৪ বছর ৪ মাস ৪দিন সেদিন তাঁকে তিনি মক্তবে কোরান শরীফ শিক্ষার জন্য প্রেরণ করনে। যখন তাঁর বয়স ১২ বছর তখন তিনি কোরান শরীফ শিক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় কিতাবাদী পাঠ সমাপ্ত করেন।

এরও পরের ঘটনা। একদিন তিনি বসে অভিধান দেখছিলেন, এমন সময় মুলতান হতে আবুবক্‌র নামে এক ব্যক্তি তাঁর উস্তাদের নিকট আগমন করলেন।

লোকটির পেশা ছিল গান করা অর্থাৎ তিনি একজন উঁচু দরের কাউয়াল ছিলেন। সে উস্তাদের নিকট তাঁর কাউয়ালী মজলিস কোথায় কিরূপ জমে উঠেছিলো এবং কোন বুজুর্গের শান (মাহাত্ম্য) কেমন এসব আলোচনা খুব বিস্তারিতভাবে চলছিলো। কথা প্রসঙ্গে সে বললো, আমি শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মজলিসে রাগ পরিবেশন করছিলাম; আমার গানের প্রথম কলিটি ছিলো–

قد لسعت حية الهوى كبدى -

অর্থাৎ নিশ্চয়ই দংশিয়াছে আমার অন্তরকে প্রেমের দংশনে। কিন্তু দ্বিতীয় লাইনিট আমি বহু চেষ্ট করেও মনে করতে পারছিলাম না। আমার দুরবস্থা দেখে হযরত যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি লাইনটি স্মরণ করিয়ে দিলেন। হযরত খা'জা নিজামউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর কানে কাউয়ালের কথাগুলো পৌঁছতে ছিলো। তিনি এ ঘটনাটি শুনার পর পরবর্তী ঘটনা শ্রবণ করার জন্য মনোযোগী হলেন। কাউয়াল হযরত বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর খানকা শরীফের মুজাহিদার কথা বলতে যেয়ে বললো যে সেখানকার দরবেশদের মুজাহিদার কথা না হয় নাই বললাম, তাঁদেরকে বাদ দিলেও বলা চলে যে সেখানকার প্রত্যেকটি লোক জাকের। এমন কি সেখানকার মেয়ে কর্মী যারা গম পিসে তারাও জেকের হতে কেউ নির্লিপ্ত নয়। আমি বহু দিন সেখানে ছিলাম। পরে সেখান হতে রওনা হয়ে পাকপাটানে হযরত শায়খুল আলম শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির দরবারে যেয়ে সম্মানিত হলাম। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও তাঁর খানকাহ শরীফের দরবেশদের মর্যাদার কথা বর্ণনা করে বলা সম্ভব নয়। তাঁর খানকাটা যেন একটা ফয়েজ (দয়া) এর দরিয়া (নদী)। আগন্তুক যত খারাপ লোকই হোক না কেন, তাঁর খানকাহ (দরবেশী আশ্রম) হতে কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যায় না। হযরত খা'জা নিজামউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি এসব কথা শ্রবণ করার পর তাঁর অন্তরে হযরত শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির প্রতি একটা গোপন প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো। সর্ব অবস্থায় তাঁর প্রেমাকর্ষণে তাঁর কথাই বলতেন। উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, শয়নে-স্বপনে ও জাগ্রত অবস্থায় তাঁরই খেয়ালে তাঁরই ধ্যানে তাঁরই সম্বন্ধে কথা বলতেন। এরপর তিনি তাঁর জন্মস্থান বাদাউন হতে উচ্চশিক্ষা ও জ্ঞান আহরণের জন্য দিল্লীতে আগমন করেন। দিল্লীতে তিনি শামসুল মুলক এর খেদমতে থেকে মাকামাতে হারিরী (শিক্ষার স্তরসমূহ)-এর ৪০ টি স্তর অধ্যয়ন করেন এবং হাদীস শিক্ষার সনদ হাসিল করেন।

সমস্ত প্রকাশ্য ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হয়ে ২০ বছর বয়সে উদ্বেলিত হৃদয়ে হযরত খা'জা শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর দর্শনের উদ্দেশ্যে অযোধন (বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত মুলতানের পাকপাটানের প্রাক্তন নাম) গমন করেন।

"রাহাতুল কুলুব" নামক গ্রন্থে (যেটা আমরা এর পূর্বেই অনুবাদ করে প্রকাশ করেছি) প্রথম মজলিসে হযরত খা'জা নিজামউদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজেই বলেছেন আমি ৬৫৫ হিজরীর রজব মাসের ১০ তারিখে বুধবার দিন অযোধন পৌঁছি এবং সে দিনই শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট বায়াত গ্রহণ করার গৌরব অর্জন করি। একই দিনে তিনি আমাকে তাঁর পবিত্র খিরকা ও খড়ম দান করেছিলেন। তারপর তিনি বললেন আমার ইচ্ছা ছিলো হিন্দের বেলায়েত অন্য কাউকে দান করা। কিন্তু তুমি এ পথেই ছিলে তাই আমার প্রতি ইলহাম হলো, 'এ নেয়ামত নিজামউদ্দিনের প্রাপ্য, যখন সে আসবে তখন তাকে দান করবে।' আমার ইচ্ছা হলো প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ তাঁকে একবার কদমবুসি করবো। কিন্তু তাঁর দিকে তাকাবার পর এমন ভীত হয়ে পড়লাম যে আমি আমার সমস্ত ইচ্ছা ও বাসনা ভুলে গেলাম। হযরত আমার মনের অবস্থা তাঁর আলোকিত অন্তর দ্বারা বুঝতে পেরে বললেন, আমার প্রতি তোমার প্রেম অত্যন্ত অধিক ছিলো কিন্তু–

لِكُلِّ دَاخِلٍ دَهْشَتْ ـ

লে কুল্লে দাখিলিন দাহ্শাত।

অর্থাৎ প্রত্যেক নব্য প্রবেশকারীর মনেই এরূপ ভয় সঞ্চারিত হয়ে থাকে। তারপর তিনি এ রুবাইটা আবৃত্তি করলেন।

اے اتش فراقت دلہاکباب کردہ

سیلاب اشتیاقت جانہا خراب کردہ

উচ্চারণ ঃ আয়ে আতশে ফারাকত দিলহা কাবাব করদাহ
সয়লাবে ইশ্তিয়াকাত জাঁনহা খারাপ কারদাহ।

অর্থ ঃ হে বিচ্ছেদের অগ্নি করেছো কাবাব ওর অন্তর
আকাঙ্খার বন্যায় বিধ্বস্ত হয়েছে যার প্রাণ।

হযরত আব্দুল হক মোহাদ্দেছ দেহেলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর আখবারুল আখিয়ার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন "যখন হযরত খা'জা নিজামউদ্দিন

রহমতুল্লাহি আলাইহি বয়াত গ্রহণ করে সম্মানিত হলেন, তখন তিনি তাঁর পীর ও মুর্শেদের নিকট আবেদন করলেন যে, যদি অনুমতি দেন তো আমি জাহেরী ইলম ত্যাগ করে আপনার প্রদত্ত শিক্ষায় একান্ত ভাবে ব্রতী হই। উত্তরে হযরত শায়খ ফরিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন , আমি কাউকে কোন প্রকার জ্ঞান অর্জনে বাধা দিই না। তুমি ইচ্ছা করলে উভয় শিক্ষায় জ্ঞানবান হয়ে থাকতে পার। কিন্তু আমার বিশ্বাস **'উলুমে ইলাহি'** (আল্লাহ প্রাপ্তির জ্ঞান) **'উলুমে জাহেরী'** (প্রকাশ্য বা প্রচলিত শিক্ষা বা জ্ঞান)-কে পরাস্ত ও পরাভূত করবে। দরবেশদের যে ধরণের শিক্ষা তা তার পথই তাঁকে শিখিয়ে নিবে। অতপর মুর্শেদের অনুমতিক্রমে তিনি খানকাহ শরীফে আল্লাহ্ তায়ালার ধ্যানে নিমগ্ন হলেন এবং মুজাহিদার রিয়াজত (কৃচ্ছ সাধনা) শুরু করলেন।

তিনি আট মাস তাঁর পীর ও মুর্শেদের খেদমতে অতিবাহিত করেন। এ সময়ের মধ্যে তাঁর মুর্শেদ তাঁকে কামালিয়াতের (পরিপূর্ণতার) স্তর অতিক্রম করায়ে খিরকা ও খেলাফত প্রদান করে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন। খেলাফত ও বেলায়েত প্রাপ্তির পর তিনি তিনবার তাঁর পীর ও মুর্শেদের নিকট স্বশরীরে গমন করেন। কিন্তু হযরত শায়খুল ইসলাম খা'জা শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লহি আলাইহির বেছাল মোবারকের সময় হযরত খা'জা নিজামউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি উপস্থিত ছিলেন না।

বেলায়েত প্রাপ্তির পর প্রাথমিক অবস্থায় তিনি দিল্লীতে অতি দীনহীনভাবে জীবন যাপন করতে থাকেন। এমনকি এক পয়সায় তাঁর আম্মাসহ দু'জনে দিন অতিক্রম করতেন। অনেক সময় এমনও হতো যে একাধারে কয়েকদিন তাঁরা অনাহারে কাটাতেন। ছিররুল আউলিয়া (আউলিয়া চরিত) গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে সৈয়দ মুহাম্মদ মুবারকুল মারুফ খা'জা আমীর খুর্দ রহমতুল্লাহি আলাইহি খা'জা নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ চেরাগে দেহলী রহমতুল্লাহি আলাইহি এর মুখে শুনেছেন, তিনি বলতেন, আমি অধমকে আমার মুর্শেদ মাহবুবে ইলাহি খা'জা নিজামউদ্দিন কুদ্দিছা ছির রুহুল আযীয নিজে বলেছেন, "আমি যখন দিল্লীতে প্রার্থনারত অবস্থায় থাকতাম তখন আমার ও আমার আম্মার একাধারে দু'তিন দিন পর্যন্ত কোন প্রকার আহারই জুটতো না। আমার আম্মার অভ্যাস ছিলো, যেদিন ঘরে কোন প্রকার আহার্য বস্তু থাকতো না সেদিন তিনি বলতেন, "বাবা নিজাম"- اِمْرُ وْزَمَّا مہمان خدائیم (ইমরুজ মা মেহমানে

খোদায়েম)" অর্থাৎ আজ আমরা খোদার মেহমান। একথা শুনলে আমার মনে এতো আনন্দ হতো যা ভাষায় বর্ণনা করতে পারছি না। আনন্দের আতিশয্যে খাবারের প্রতি আমার কোন আকর্ষণই থাকতো না। এমনি দিনের কোন একদিন এক লোক আমার আম্মাকে এক টাকার গম নজরানা হিসেবে দিয়েছিলেন, যার জন্য পরপর বেশ কয়েকদিন ঘরে রান্না হতো। কিন্তু এতে আমার খুব বিরক্ত লাগতো, আমি মনে মনে বলতাম, সে দিনটি কবে আসবে যে দিন মা বলবেন, "বাবা নিজামউদ্দিন আজ আমরা খোদার মেহমান!" শেষ পর্যন্ত সে গম একদিন শেষ হলো এবং ইফতারের সময় মা বললেন, "বাবা আজ আমরা খোদার মেহমান," এ কথা শুনেই আমার মন এক অনাবিল আনন্দে নেচে উঠলো, যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। "ছিররুল আউলিয়া" গ্রন্থের লেখক বলেন, আমি নিজে আমর পিতা সৈয়দ মোবারক মুহাম্মদ কিরমানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট শুনেছি যে, যখন হযরত মাহবুবে ইলাহি খা'জা নিজামউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি গিয়াশপুর (বর্তমানে এ স্থানের নাম নিজামউদ্দিন এবং এ স্থানেই হযরতের মাজার শরীফ বিদ্যামান) খানকায় আগমন করলেন তখন খানকায় অপর লোকের আহার চলা দূরে থাক তাঁদের নিজেদেরকেই অনাহারে কাটাতে হতো; যার জন্য খানকার বাসিন্দা বলতে ছিলেন তিনি এবং তাঁর আম্মা।

মাহবুবে ইলাহি নিজেই বলেছেন, যখন দিল্লীর বাদশাহ সুলতান ময়েজউদ্দিন কায়কোবাদ গিয়াশপুরকে উন্নয়ন করার কাজে হাত দিলেন তখন আমার এখানে লোকজনের ভীড় বাড়াতে লাগলো এবং মাঝে মধ্যে ধনীদেরও আগমন ঘটতে লাগলো। এটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগতো। ভাবলাম এ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু সেদিনই এক দুর্বল অথচ অত্যোজ্জ্বল যুবক আছরের সময় খানকায় এসে নিম্নোক্ত মসনবীটি পাঠ করলেন।

انروزکه مه شدی نمید انستی
کانگشت نمائے عالمی خواهی شد
امروزکه زلفت دل خلقے بر بود
درگو شه نشست نمیدارد سود

উচ্চারণ ঃ আঁ রোজ কে মাহ্শুদি নামি দানাস্তি
কাঁগাস্ত নুমায়ে আলমি খোয়াহি শুদ
ইমরোজ কে জুলফতে দিল খালকে বরে বুদ
দরগুশাহ নাশাস্ত নামি দারাদ সুওদ

অর্থাৎ জান না যে দিন হয়েছো তুমি মহান অতি
তোমার দস্তরখান হবে,হবে জগতেরই শীঘ্র অতি
অন্তর্ধান হও যদি মানবের অন্তর হতে আজ তুমি
একাকীর উন্নয়নে কি লাভ হবে শুনি?

মসনবীটি পাঠ করে তিনি বললেন, "মানুষের প্রথমেই বিখ্যাত হওয়া উচিত নয়। যখন পরিচিত হয়েই যাবে তখন আর নিজেকে লুকিয়ে রাখার চিন্তা করাও উচিত নয়। কেননা তাহলে কিয়ামতের দিন হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সাল্লাম-এর নিকট লজ্জিত হতে হবে। বেলায়েত প্রাপ্তির পর মানুষকে ত্যাগ করে শুধু নিজের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণে নিমগ্ন হওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক ও হীনমন্যতার পরিচয়। বরং বীরত্বের কাজ হচ্ছে মানুষের গমনাগমনের ধারাকে প্রবাহিত রেখে আল্লাহতে বিলীন থাকা। তাঁর বলা শেষ হলে তাঁর জন্য আহারের ব্যবস্থা করা হলো। তিনি আহার হতে ততক্ষণ পর্যন্ত বিরত রইলেন যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত মাহবুবে ইলাহি তাঁর খানকাহ্ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করলেন। অবশেষে হযরত খা'জা নিজামউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করায় আগন্তুক যুবক সামান্য আহার গ্রহণ করলেন এবং চলে গেলেন। এ ঘটনার পর ঐ যুবককে আর কোন দিনও দেখা যায় নি।

হযরত মাহ্বুবে ইলাহি খা'জা নিজামউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে যখন গিয়াশপুরেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন আল্লাহ তাঁকে আহার্যের প্রাচুর্যতা দান করলেন এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তাঁর অনুগত করে দিলেন। এরপর থেকেই হযরতের দরবারের নজর-নিয়াজের ঢল বইতে লাগলো এবং গরীব জনসাধারণ এ থেকে ভীষণভাবে উপকৃত হতে লাগলো। হযরত এ সব মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি হতে নিজেকে দূরে রেখে রিয়াজত ও মুজাহেদায় (আধ্যাত্মিক সাধনায়) নিমগ্ন থাকতেন। কথিত আছে যে শেষ বয়সে যখন তাঁর বয়সের কোঠা আশি অতিক্রম করে তখনও তিনি যৌবন বয়সের মতো মুজাহিদা করতেন। প্রত্যেকদিন রোজা রাখতেন, ইফতারের সময় অতি সামান্য আহার করতেন এবং সেহ্রী মোটেই খেতেন না। তাঁর এ বয়সে এরূপ মুজাহিদা দেখে খানকার খাদেম ও দরবেশগণ আরজ করলেন যে যদি এভাবে ইফতার কম গ্রহণ করেন ও সেহ্রী না খান

তাহলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। এ কথা শুনে হুজুর কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, বহু দরবেশ ও মিসকিন অনাহারে ক্লিষ্ট হয়ে আজও দোকানের আশেপাশে ও মসজিদে পিপাসার্ত অবস্থায় কালাতিপাত করছে, সে অবস্থায় আমি কি করে পেটপুরে আহার করি? এ দৃশ্য যখন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে তখন আহার্য বস্তু আমার কণ্ঠনালীর নিচে নামতে চায় না। এ কথা বলতে বলতে তিনি অঝরে কাঁদতে লাগলেন। কান্না বন্ধ না হওয়ায় তাঁর সম্মুখ হতে আহার সরিয়ে নেয়া হলো।

হযরত মাহ্‌বুবে ইলাহি নিজেই বলেছেন, একবার আমি আমার পীর-মুর্শেদের সঙ্গে নৌকা ভ্রমণে ছিলাম, তখন তিনি আমায় বললেন দিল্লীতে মোজাহিদা করবে। অলস থাকা ভালো নয়। সর্বদা রোজা রাখবে। কেননা রোজায় নফ্‌স কাবু থাকে এবং রূহের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এরপর তিনি বললেন, "নিজামউদ্দিন, খোদার নিকট প্রার্থনা করছি যে, তুমি তাঁর পবিত্র দরবারে যা চাইবে তাই আল্লাহ্ জাল্লেশানহু তোমাকে দান করবেন।

বর্ণিত আছে যে তিনি রাতে তাঁর বিশিষ্ট হুজরার দরজাটি ভিতর হতে অর্গলাব্ধ করে সারারাত প্রেমাস্পদে বিলীন থাকতেন। সকালে দরজা খুলে যখন বের হতেন তখন চোখে মুখে নূর চমকাতো। এ অবস্থায় যে তাঁকে দেখতেন সেই যেন একজন পূর্ণ প্রেমিকে রূপান্তরিত হয়ে যেতেন এবং সে নিজেকে মনে করতেন একজন প্রেমিক উম্মত ও লয়প্রাপ্ত ব্যক্তি। হযরত আমীর খসরু রহমতুল্লাহি আলাইহি এ সম্বন্ধে বলেন–

تو شبانه می نمائی ببرکه بودی امشب

که هنوز چشم مستت اثر خمار دارد

বাংলায় উচ্চারণ ঃ তু শাবানা মি নুমাই বে বর কে বুদি ইমশব

কে হনুজ চশমে মাস্তাত আছারে খুমার দারাদ।

অর্থ ঃ গোপন তুমি বিকাশ আমি অস্তিত্ববান এ রাত

মত্ততা রয়েছে এখনও তোমার চোখে আমি দেখে দিশেহারা।

একবার এক ব্যক্তি তার মুক্তি পত্র হারিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। সে উপায়ান্তর না দেখে হযরত খাজা নিজামউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি এর খেতমদে উপস্থিত হয়ে তার হারানো প্রাপ্তির জন্য দোয়া করতে বললেন। এ সময় তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খুশ (প্রফুল্ল) ছিলো, তাই তিনি মুচকি হেসে বললেন–

حلوابروح پاك حضرت گنجشكر بده -

উচ্চারণ ঃ হালুয়া বরুহে পাক হযরত গঞ্জেশকর্ বাদাহ।

অর্থাৎ হযরত গঞ্জে শকর রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর রুহের উপর হালুয়া নজরানা দাও।

প্রার্থনাকারী ভক্তি শ্রদ্ধা পালন করে হালুয়া কেনার জন্য দোকানে গেলো। সে দোকানদারকে বললো কিছু হালুয়া দিতে। দোকানদার একটা কাগজের মধ্যে তাকে হালুয়া দিলো। সে মূল্য পরিশোধ করে যখন হালুয়া হাতে নিলো তখন হালুয়া বাঁধা কাগজটি দেখে তাঁর চক্ষুস্থির। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো কাগজটির দিকে–এই তো সেই মুক্তি পত্র যেটা সে হারিয়ে ফেলেছিলো। তারপর সে দৌড়ে হযরতের নিকট আগমন করে তাঁর কদমে পড়ে রইলো এবং হালুয়া সকলের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হলো।

বর্ণিত আছে যে তিনি দেহ ত্যাগের ৪০ দিন পূর্ব হতে আহার করা প্রায় একেবারেই ত্যাগ করেছিলেন। এতে রোগের প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পেলো। মাঝে মাঝে তিনি বেহুশ হয়ে যেতেন এবং জ্ঞান ফিরলে বলতেন, "আমি নামায পড়েছি কিনা?" যদি বলা হতো, হ্যা, আপনি পড়েছেন, তাহলে তিনি বলতেন আর একবার পড়ে নেই। এমনি করে একই নামায তিনি দু'বার তিনবার পড়তেন। এ সময় তিনি প্রায়ই বলতেন, আমরা যাব। আমরা যাব!! আমরা যাব!!! যখন হযরতের শেষ সময় ঘনিয়ে এলো তখন খানকার খাদেম ইকবালকে ডেকে বললেন, খানকার মধ্যে কোন জিনিস রেখো না সব বিলিয়ে দাও। ইকবাল নির্দেশ মোতাবেক সব জিনিসই বিলিয়ে দিলেন, শুধু দরবেশদের জন্য তিন চার দিনের খোরাক রেখে দিলেন। হযরত মাহ্বুবে ইল্লাহি এ সংবাদ শুনতে পেয়ে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হলেন এবং তাকে ডেকে বললেন কি জন্য এ সব রাখা হয়েছে? ঐ সব এখনই বিলিয়ে দিয়ে খাদ্য গুদাম ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলো। কেন না এমন না হয় যে কেয়ামতের দিন আমাকে এর জন্য অর্থাৎ সঞ্চয় রেখে যাওয়ার জন্য জবাবদিহি করতে হয় ; তখন আমি মুখ দেখাবো কি করে? আদেশ অনুযায়ী খাদেম অবশিষ্ট দ্রব্য দরবেশদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। একটি শস্যদানাও অবশিষ্ট রইলো না। এ ঘটনার সাথে সাথে খানকার অন্যান্য খাদেম ও দরবেশগণ উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা হযরতের দিনগুলো এ যাবৎ এতো শানশওকতের সঙ্গে অতিবাহিত করায়েছেন যা দেখে বাদশাহ্দের মনেও

হিংসার উদ্রেক হতো। আপনার কাছে এখন আমাদের আরজ হচ্ছে, আপনার অন্তর্ধানের পর আমাদের অবস্থা কি হবে? তিনি বললেন যারা আমাদের চিশতীয়া তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আমার খানকায় তাদের জন্য এতো অধিক নজর নিয়াজ আসবে যা তাদের প্রয়োজন মিটেও উদ্বৃত্ত থাকবে।

তিনি ৭২৫ হিজরীর ১৮ই রবিউস্‌সানী বুধবার সূর্যোদয়ের পর পরলোকে স্রষ্টার সঙ্গে মিলিত হন। তাঁর পবিত্র মাজার শরীফ দিল্লী শহর হতে তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। স্থানটির নাম পূর্বে ছিলো গিয়াসপুর, বর্তমানে নিজামউদ্দিন। তাঁর মাজার শরীফ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত।

এ সংক্ষিপ্ত জীবনীতে হযরত মাহ্‌বুবে ইলাহি রহমতুল্লাহি আলাইহির পূর্ণাঙ্গ জীবন তুলে ধরা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। তাই অতি সামান্য যা বর্ণনা না করলেও নয় তাই করা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে হলে তাঁর জীবনী পাঠ করুন।

হযরত **খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের** বলতে এ পুস্তকে আমরা হযরত খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহিকে বুঝবো।

—০—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম মজলিস

সোমবার, ২০শে রজব, ৬৮৯ হিজরী। আলোচনা চলছিলো সশ্রদ্ধ ও শ্রদ্ধধান আদম আলাইহিস সালাম সম্বন্ধে। প্রথম তাঁর সৃষ্টি নিয়ে কথা হচ্ছিলো।

আমি কলমষ-কলুষিত খসরু, বিশ্ববিধাতা জগৎপালক কৃপানিধানের কৃপা ও করুণার অভিলাষী। উৎকট ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত রয়েছি এ জন্য যে অধম-অভাজন ও দাস পরিচালক শ্রদ্ধেয় পীরাধিপতি মহাত্মন নিজামউদ্দিন আউলিয়া (বিধাতার আশীষ বর্ষিত হোক তাঁর উপর) এর পবিত্র পদপল্লব চুম্বনের ঐশ্বর্য আমি নিকৃষ্ট নরাধমের ভাগ্যে সৌভাগ্যরূপে ঘটবে কিনা।

অশেষ, অফুরন্ত ও অনন্ত দয়ালু পবিত্র স্রষ্টার রহমত বর্ষিত হলো এ অধমের উপর যার বদৌলতে পেলাম তাঁর পবিত্র কদম চুম্বনের সৌভাগ্য। সাথে সাথে এক অনাবিল শান্তিতে আপ্লুত হলাম।

মহামান্য সুফিদরবেশগণ খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। আমি দাঁড়িয়ে আছি কিছু বলবো বলে। হুজুর আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, 'দাঁড়িয়ে কেন? বসো এবং যা বলতে হয় বসেই বলো'। আমি দ্বিতীয়বার কদমবুসি করে বললাম, হুযুর, এ অভাজন হুযুরের পবিত্র জবান হতে নিঃসৃত অমিয়বাণীগুলো এ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করার পর তার কলেবর একটা পুস্তকে ধারণের পরিমান মতো হয়ে গেছে। আমি সেটার নাম দিয়েছি–

اَفْضَلُ الْفَوَائِدِ আফজালুল ফাওয়ায়িদ–আলোচ্য মর্যাদাপূর্ণ কিতাবটি আপনি দেখেছেন। এখন আমি অনুমতি চাচ্ছি এ জন্য যে এবার থেকে আপনি যা বলবেন সেগুলো সলুকের অন্তর্ভুক্ত করবো এবং সে জন্য অনুরোধ করছি যে এখনকার মজলিসগুলো যদি আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম সম্বন্ধে আলোচনা হয় তাহলে বক্তব্য তাসাউফ বিষয়বস্তুর পরিপূর্ণতার দিকে রূপ নিবে। আমার কথা শেষ হলে তিনি মুচকি হেসে বললেন, খুব ভালোই হলো, আমিও আজ তোমার আসার একটু পূর্বে এ বিষয়ের উপরই আলোচানা শুরু করেছি।

হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের (খাজা নিজামউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বক্তব্য শুরু করে বললেন, হে প্রিয়গণ, যখন আল্লাহ্ জাল্লে শানহু বিপদের ভান্ডার তৈরি করলেন তখন শুধুমাত্র আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম ও আউলিয়া কেরামদের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। ফেরেস্তাগণ সেই বালা মুসিবতের কোষাগার দর্শন করে ভয়ে বিগলিত হওয়ার উপক্রম। তারা মস্তক সেজদাবনত করে নিবেদন করলো, এ ভান্ডার কাদের জন্য? সাথে সাথে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ এলো, হে ফেরেস্তাগণ, তোমরা এ নেয়ামতের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত। আমি এ সব আমার প্রতিনিধিদের (খলিফা) জন্য রেখেছি। তাদেরকে আমি পৃথিবীতে পাঠাবো। এ বালা (বিপদাপদ-দুঃখ-কষ্ট) হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর বংশধরদের জন্য। যারা আমার বন্ধু হবে তাঁদের বন্ধুত্বকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁদের উপর এ বালা নাজেল করা হবে এবং যারা আমার সঙ্গে প্রেমের দাবী করবে তাদের জন্য এ বালা বিশেষভাবে নাজেল করা হবে। প্রকৃত বন্ধুত্ব দাবীকারীরা এ বালায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবে এবং এ বালা মুসিবত তাদের প্রতি নাজেল না করলে তারা অসন্তুষ্ট হবে। বন্ধুত্বের নিশানা হবে বিপদ কামনা করা।

এরপর খাজা মাহ্বুবে ইলাহি বললেন, হে দরবেশগণ, যাঁরা স্রষ্টার প্রেম ও বন্ধুত্বে বিলীন হয়ে আছে তাঁরা দিবা-রাত্র "বালা" (বিপদাপদ) কামনা করে অতিবাহিত করেন। কারণ এ বালা আগমন করে বন্ধুর নিকট হতে। তাই এ দুঃখকে তাঁরা দুঃখ মনে না করে প্রেমের পরশ ও স্রষ্টার স্মরণ মনে করে সন্তুষ্ট চিত্তে বরণ করে নেয়। এ সম্বন্ধে একজন প্রকৃত প্রেমিকের ঘটনা বলছি–তিনি প্রতিদিন সকালে দোয়া চাইতেন, ইয়া বারে ইলাহি, আমাকে প্রতিদিন আহারের জন্য দুঃখ ও বিপদাপদ ছাড়া অন্য কিছু পাঠিও না। কেননা আমার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য হচ্ছে বালা বা দুঃখ দুর্দশা। কোন ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলো, তুমি এমন দোয়া কি করে কামনা কর? এমন দোয়া চাওয়া কি ঠিক? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "আমার বক্তব্য অত্যন্ত সহজ ও সরল। কারণ, বন্ধুত্বের পরীক্ষা হয় বালার মাধ্যমে। যদি আমি এ দোয়া কামনা না করি তাহলে কোন দিনই সালেকদের মাঝে আমার স্থান থাকবে না।" হযরত মাহ্বুবে ইলাহি খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের এ ঘটনা বলতে বলতে তাঁর অক্ষিযুগল অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো এবং সেই অশ্রুসজল নয়নে নিম্নোক্ত রুবাইটি পাঠ করতে লাগলেন–

هرجاکه بلائے تست برجانم باد
چوں درد رضائے تست برجانم باد
گربر سرعاشقان بلاہا باشد
انجملہ بلائے تست برجانم باد

বাংলায় উচ্চারণ ঃ হর জাকে বালায়ে তুস্ত বর জা নুম বাদ
চুঁ দরদে রেজায়ে তুসত বর জাঁ নুম বাদ
গর বরসরে আশেকানে বালাহা বাশদ
আঁ জুমলাহ বালায়ে তুসত বর জা নুম বাদ

বাংলা অর্থ ঃ বালা মুসিবত যা কিছু আছে, সব দাও মোরে করিব বরণ
যে বিপদাপদ করছে অপেক্ষা তব ভান্ডারে তাও
করিব বরণ যদিও রাখ ভিজায়ে তোমার আশেকদেরে
তবু অধিক প্রত্যাশী আমি, বালা গ্রহণ করতে।

রূবাই পাঠান্তে তিনি বললেন, হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টির প্রাক্কালে দেহ সৃষ্টির পর যখন কলবে রুহ সংস্থাপন করা হলো তখন তিনি উঠতে চাইলে হাঁচি এলো, তিনি বললেন, আল্হামদু লিল্লাহ্ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। এ সময় হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি উত্তরে বলরেন, ইয়ারহামুকাল্লাহ্। তখন ফেরেস্তাদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ এলো, "হে ফেরেস্তাগণ, তোমরা বলতে যে এ কওম (দল) ফ্যাসাদ করবে এবং বিনা কারণে রক্তপাত ঘটাবে। এখন দেখলে তো সেই কওম তার বাক্যের শুরুতেই সে আমার প্রশংসা ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ আমার নামের প্রশংসাই হলো তার সর্ব প্রথম বাক্য। আল্লাহ্ তায়ালা এ ঘটনাকে কুরআন শরীফে এ ভাবে বলেছেন–

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ـ

এ আয়াতের পর ফেরেস্তাগণ মাথা সেজদাবনত করে আরজ করলো–

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ -

সংক্ষেপে-এর অর্থ হচ্ছে তুমিই একমাত্র জ্ঞানবান আমরা অজ্ঞ।

হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের দেহে রুহ সঞ্চারিত করার পর শ্রদ্ধেয় জিব্রীল, মিকাইল ও ইস্রাফিল আলাইহিস সালামদেরকে নির্দেশ দিলেন, বেহেস্তে যেয়ে পোষাক এনে শ্রাদ্ধধান আদম আলাইহিস সালামকে পরিধান করাও। হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালাম বেহেস্ত হতে পোষাক আনলেন, হযরত মিকাইল আলাইহিস সালাম আনলেন বোরাক এবং হযরত ইস্রাফিল আলাইহিস সালাম আনলেন তাজ। অতপর আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে তাঁকে এসব পরানো হলো। তারপর হুকুম হলো, আদম আলাইহিস সালামকে বোরাকে বসিয়ে বেহেস্তে নিয়ে মহামূল্যবান পাথরের তৈরী সিংহাসনে বসাও। যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে উক্ত সিংহাসনে বসানো হলো, তখন সকল ফেরেস্তাদের প্রতি হুকুম হলো, হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করো। কোরান পাকে আছে।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ -

অতপর ফেরেস্তাগণ সেজদা করলো কিন্তু ইবলিস সেজদা করলো না। সুতরাং সে দরবার হতে বহিস্কৃত হলো। সমস্ত ফেরেস্তা এ দৃশ্য দেখে উচ্চস্বরে বলে উঠলো, "ইবলিসের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক।" এ ঘটনা বলতে বলতে শ্রদ্দধান ইলাহির বন্ধু মাননীয় নিজামউদ্দিনের (করুণাময়ের করুণা বর্ষিত হোক তাঁর উপর) অক্ষিযুগল অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, হে দরবেশগণ, ইবলিস একই সঙ্গে অভিশপ্ত ও বহিস্কৃত হয়েছে। আজকাল এমন অনেক মুসলমান আছে যাদের লজ্জাজনক কর্মের পরিণাম ইবলিস হতেও জঘন্য এবং প্রত্যেকদিন হাজার বার তাদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার লানত (অভিসম্পাত) নিপতিত হয় কিন্তু তারা সে সবের কোন খবরই রাখে না। কারণ তারা এসব খবর রাখতে আগ্রহী নয়। এরপর এরশাদ করলেন, যখন হযরত আদম আলাইহিস সালাম 'জান্নাতুল মাওয়ায়' স্থায়ী হলেন, তখন সমস্ত বিশ্ব ও কালের

ফেরেস্তা ও বাসিন্দাদেরকে তাঁর এ সম্মান ও মর্যাদা দেখিয়ে তাঁর প্রতি অনুগত করানো হলো। তারপর ফেরেস্তাদের প্রতি হুকুম হলো, আদম আলাইহিস সালাম-এর নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করো, কেননা তাঁর মতো জ্ঞান ফেরেস্তাদেরকে দেয়া হয় নি। এসব ঘটনার পর হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের প্রতি আল্লাহ্ পাকের হুকুম হলো, বেহেস্তের সকল নে'মত (অনুগ্রহ) ভোগ করতে পারো যথা খুশি যেতে পার শুধু এ বৃক্ষের নিকটে এসো না এবং এখান হতে কিছু খেয়োনা। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিলো তাঁকে তিনি দুনিয়ায় প্রেরণের মাধ্যমে মানবজাতিকে পরীক্ষা করে বাছাই করবেন। তাই সশ্রদ্ধ আদম আলাইহিস্ সালামের অন্তরে আল্লাহ জাল্লে জালালহু উক্ত বৃক্ষের প্রতি অগ্নিপ্রেম সংস্থাপন করে দিয়েছিলেন, যার জন্য তিনি স্রষ্টার নির্দেশকে অমান্য করে সে বৃক্ষের ফল ভোগ করেছিলেন এবং সাথে সাথে তাঁর ও তাঁর বিবির শরীর হতে বেহেস্তী পোশাক খসে পড়েছিলো, মস্তকও হয়ে পড়েছিলো অনাবৃত আর শরীর হয়েছিলো নগ্ন যার জন্য তাঁদের দেহ বেহেস্তে থাকার জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়েছিলো। বৃক্ষরাজি হতে আওয়াজ হলো, হে অপরাধীগণ বেহেস্ত হতে চলে যাও কেননা এ স্থান তোমাদের থাকার জন্য নয়। কোরান শরীফে ঘটনাটি এসেছে এরূপ–

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى -

নগ্নদেহে মহাত্মন আদম আলাইহিস্ সালাম বেহেস্তের প্রত্যেকটি গাছের নিকট যেয়ে সহানুভূতি কামনা করে বলেছিলেন যে, অন্তত আমার সাথী স্ত্রীলোকটির (বিবি হাওয়া) জন্য কিছু পাতা দাও যাতে তাঁর লজ্জাস্থান ঢাকা যায় কিন্তু প্রত্যেক গাছ বলেছিলো, তোমরা দোষী তোমাদের জন্য আমাদের কোন সহানুভূতি নেই। এভাবে যখন তিনি আঞ্জির (ডুমুর) গাছের নিকট যেয়ে সাহায্য কামনা করলেন তখন সে গাছ তাঁকে তাঁর সঙ্গিনীর লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য কয়েকটা পাতা দিলো। আল্লাহ্ পাক তখন সেই গাছকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আঞ্জীর বৃক্ষ, তুমি ওদেরকে পাতা দিলে কেন? গাছ নিবেদন করলো, ইয়া ইলাহি আমি তাঁর লজ্জাস্থান অবলোকন করার পর তোমার করুণায় অভয় পেলাম যে, তুমিই এভাবে তাঁর লজ্জাস্থান ঢাকার ব্যবস্থা করবে। তাই তাঁকে পাতা দিতে ইতস্তত করিনি। ইলাহির নির্দেশ এলো, হে আঞ্জীর (ডুমুর) বৃক্ষ সৃষ্টির মাঝে

আমি তোমাকে মূল্যবান করলাম। তফসীরের কিতাবে আছে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে বেহেস্ত হতে সরনদ্বীপের পাহাড়ের (বর্তমান শ্রীলংকা) উপর নিষেধ অমান্যের কারণে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো এবং এ অপরাধের জন্য ৩০০ বছর পর্যন্ত অনুশোচনায় কেঁদেছিলেন তিনি। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর মুখমন্ডলের মাংস গলে গিয়েছিলো এবং গন্ডদেশে সৃষ্টি হয়েছিলো বিরাট গর্ত আর সেই গর্তে পাখীরা তাদের বাসা বেধেছিলো। তিনি অনুশোচনায় এমনই নিমজ্জিত ছিলেন যে পাখীর বাসার কোন খবরই রাখতেন না। (বর্ণিত আছে যে তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য ছিলো ৬০ হাত)। তাঁর অশ্রুজলে মাটি ভিজে গিয়েছিলো এবং ঘাস ও বৃক্ষ এতো অধিক বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে তার দেহ তাতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো। এ ঘটনা বর্ণনা করার সময় হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়েরের চোখের পাতা বারে বারে ভিজে উঠছিলো। তিনি বললেন, প্রেমের কশাঘাতের পরশ সহন পরীক্ষার সূত্রপাত এখান থেকেই। যখন দৃষ্টি মেলে তাকালেন তখনই প্রেমের মনোহারিতার আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে বিকর্ষণের বিচ্ছেদে এ অশ্রুবন্যা। তাঁর বেহেশ্‌ত হতে পদ উত্তোলন ও নির্জন পৃথিবীতে পদচারনা হচ্ছে স্রষ্টার বিকাশ ও প্রকাশের সূচনা। কেননা আয়াশ ও আরাম বহুল বেহেস্তের মাঝে প্রেম শিক্ষা ও তার উন্মেষ এবং তা বিস্তার ও প্রসার সম্ভব ছিলো না। তাই এ বিজন ও দূরতিক্রম্য পৃথিবীকে নির্বাচন করেছেন সেই প্রেম শিক্ষার পাঠশালা ও পরীক্ষা কেন্দ্র রূপে। আর সেই পরীক্ষাগুলো হচ্ছে কষ্টের পর অসহ কষ্ট এবং দুঃখের পর অসহ দুঃখ, যা নেমে আসে তাঁর বন্ধুত্ব কামনাকারীদের উপর।

إِنَّ أَشَدَّ الْبَلَاءِ فِى الْأَوْلِيَاءِ وَأَشَدَّ مِنْهَا فِى الْأَنْبِيَاءِ -

এ পর্যন্ত বলতে বলতে খা'জা মাহ্‌বুবে ইলাহি রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি সেই অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে অসহ যন্ত্রনার যাঁতাকলে আবদ্ধ থাকাকে বন্ধুর করুণা ও স্মরণ মনে করে সন্তুষ্ট থাকেন। এ বালা মুসিবত ও দুঃখ-দুর্দশা আনন্দচিত্তে গ্রহণ করার পরই তাঁরা পেয়েছেন মাওলার প্রকৃত বন্ধুত্ব।

اَلْمَحَبَّةُ فِى الْمُحِبِّيْنَ -

অর্থাৎ প্রেমিকের মাঝেই রয়েছে প্রেম। যিনি প্রথম এ দুনিয়ায় প্রেমের যন্ত্রনা সহ্য করেছেন তিনি হচ্ছেন হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম। এ বিষয়ে তিনি নিম্নোক্ত রূবাইটি আবৃত্তি করলেন–

ازبهرروخ تو مبتلا می باشم ـ
واندر غم عشق تو بلامی باشم
دریاد جمال تو چنان مشغولم
کزخود خبرے نیست کجامی باشم ـ

বাংলা উচ্চারণ ঃ আয বহ্‌রে রুখ মুবতালা মি বাশম
ওয়ান্দার গমে ইশক তু বালা মি বাশম
দর ইয়াদে জামাল তু চুনান মশগুলম
কিয খুদ খবরে নিস্ত কুজা মি বাশম।

অর্থ ঃ প্রেমিক ছিলে তুমি নদীর মোহনায়, তখন স্তব্ধ ছিলাম আমি,
যবে অন্তরে মম ছিলে দুঃখ রূপে তুমি, তখন শান্ত ছিলাম আমি।
তোমার মনমুগ্ধকর রূপের ধ্যানেতে যবে মশগুল ছিলাম আমি,
তখন তুমি বিরূপ ছিলে, আর অচৈতন্যে স্তব্ধ ছিলাম আমি।

খা'জা যিকরুল্লাহ্ বিল খায়ের এরপর বললেন, হযরত আদম আলাইহিস সালাম এক সুদীর্ঘ সময় (৩০০ বছর) দুঃখের যাঁতাকলে কষ্ট ভোগের পর ইলাহির নির্দেশ এলো, "আয়ামে বেজের" রোজা রেখে তওবা করলে তোমার তওবা কবুল হবে। নির্দেশ পাওয়ার পর তিনি রোজা রাখলেন এবং তাঁর দোয়া কবুল হলো। এরপর পরে কোন এক সময়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আপনি এক সুদীর্ঘ কাল বেহেস্তে অতিবহিত করেছেন এবং দুনিয়ায়ও এসেছেন বহু শত বছর হলো, এর মাঝে কখনও আপনার ইচ্ছাপূরণ হয়েছিলো কি? হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম উত্তরে বললেন, হ্যা, হয়েছে, যখন আমি ৩০০ বছর 'বালা'র মধ্যে ছিলাম সেই সময় আমার ইচ্ছা পূরণ হয়েছিলো। সে সময় যে দুঃখ, দুর্দশা ও নির্যাতন আমার উপর বর্ষিত হয়েছিলো, তাঁর কারণ ছিলো একটা রহস্যের উন্মোচন করা যা আমি করতে পেরেছিলাম। হযরত খা'জা মাহবুবে ইলাহি নিজামউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন এ ঘটনা বর্ণনা করছিলেন তখন শৃংখল পরিহিত ছয়জন দরবেশ খানকা শরীফে আগমন করে নৃত্য করতে লাগলো। কোন প্রকার সালাম-দোয়া যা মুসলমানদের কর্তব্য, তাতো করলোই না এমনকি হুজুরের প্রতিও কোনরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলো না। কিছুক্ষণ নৃত্য করে তারা বসে পড়লো এবং অকথ্য ও অশ্রাব্য সব কথা বার্তা বলতে লাগলো,

না বলা ও শোনার অযোগ্য। হযরত তাদের কথা ভ্রুক্ষেপ না করে মাওলানা ফখরুদ্দীন জারাদীকে, আমাকে ও আমার ছেলেদেরকে বললেন, যে সব খাবার প্রস্তুত আছে তা ঐ দরবেশদেরকে পরিবেশন করো। আমরা তাদের জন্য খাবার নিয়ে গেলাম। তারা আমাদের নিকট হতে খাবার গ্রহণ করে দূরে ফেলে দিলো এবং জঘন্য ভাষায় যা তা বলতে লাগলো। তাদের এ ব্যবহারে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম, কারণ হুজুর যদি এ সম্বন্ধে জানতে চান তাহলে কি বলবো? শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো যে আমরা বলার পূর্বেই হযরত খা'জা ব্যপারটা জেনে গেছেন। হযরত নিজেই তখন আবার নতুন ভাবে তাদরে জন্য আহার নিয়ে কয়েকজন খেদমতগারসহ তাদরে সম্মুখে উপস্থিত হলেন, প্রথমে তিনি দরবেশদেরকে সালাম দিলেন, কিন্তু দরবেশরা তাঁর সালামের কোন উত্তর তো দিলোই না এমন কি তাঁর প্রতি কোন মনযোগও দিলো না। হযরত খা'জা খাবার সামনে রেখে তাদেরকে আহারের জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। কিন্তু তারা বাজে গানে নিমগ্ন হয়ে রইলো। এ বিশ্রী পরিবেশ বেশ কিছুক্ষণ অবলোকন করার পর হযরত খা'জা তাদেরকে বললেন, হে দরবেশগণ, এ খাবার কেন খাচ্ছ না? এ খাবার কি করণের খাবারের চেয়েও নিকৃষ্ট, যা তোমরা সেখানে কাবাব করে খেয়েছিলে? কিন্তু আমি বলছি, না, এ খাবার সে খাবার হতে নিকৃষ্ট তো নয়ই বরং শত-হাজার গুণ অধিক উৎকৃষ্ট। দরবেশগণ একথা শ্রবণ করার সাথে সাথে হযরত খা'জার কদম মোবারকে মাথা রাখলো এবং পরে এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, হুজুর আপনি দয়া করে আর কষ্ট করবেন না। আপনি যান আমরা খাবর খেয়ে নিচ্ছি। আমরা শুধু আপনাকে অবলোকন করার জন্যই এরূপ করছিলাম। দরবেশদের এরূপ বিপরীত ব্যবহারে আমরা আরও বিস্মিত হয়ে পড়লাম। হুজুর চলে যেয়ে মজলিসে যোগ দিলেন। আমরা দরবেশদেরকে আহার পরিবেশন করাতে লাগলাম। আহার পর্ব শেষ হলে আমি ও মাওলানা ফখরুদ্দীন জারাদী তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, হে দরবেশগণ, আপনাদের এ অদ্ভুত আচরণের অভ্যন্তরে কোন্ রহস্য লুকিয়ে আছে একটু খুলে বলুন না? উত্তরে তারা বললো দেশ ভ্রমণ করতে করতে একবার আমরা করণ শহরে পৌঁছলাম। করণ শহরটি ছিলো তখন দুর্ভিক্ষ এলাকা। বিশেষ করে আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন সেখানে জন মানবের নাম গন্ধও ছিলো না। আমরা বিপাকে পড়ে গেলাম সেই বিজন স্থানে। একদিন দু'দিন করে তিনদিন অতিবাহিত হতে চললো, সেই সঙ্গে ক্ষুধার যন্ত্রনাও বাড়তে বাড়তে এক ভীষণ রূপ নিলো। আমরা আহারের অনুসন্ধান করতে করতে দিশেহারা হয়ে পড়লাম। এ সময় পথ চলতে চলতে আমরা শ্রান্ত-ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট-প্লিষ্ট হয়ে হযরত ওয়ায়েস করনী রহমতুল্লাহি আলাইহি যে স্থানে হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম-এর দান্দান শহীদ হওয়ার সংবাদ শুনে তাঁর প্রতি তূলনাহীন মুহাব্বতে নিজের ৩২টি দাঁত একের পর এক শহীদ করে দাফন করেছিলেন, সেই স্থানে পৌছলাম। সে স্থানটিও ছিলো জনহীন, তাই আমরা জিয়ারত পর্ব সমাধা করে আহারের অনুসন্ধানে সম্মুখে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে পথিমধ্যে দেখতে পেলাম কয়েক দিন পূর্বের মরা একটা উট। তার মাংস পঁচে ফুলে-ফেটে হাড় থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। বিশ্রী উৎকট দুর্গন্ধ। তবু যেন মনে হলো এটাই বাঁচার জন্য আশার আলো। সকলে একত্রে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম, 'জান বাঁচানো ফরজ' অতএব এর মাংস বের করে চকমকি পাথর দিয়ে আগুণ জ্বালিয়ে সেঁকে কাবাব বানিয়ে আহার করেছিলাম সে দিন। অবশ্য আমরা এ ছ'জন ব্যতীত অন্য কোন লোক এ ঘটনা সম্বন্ধে জানতেন না। অথচ আজ হযরত খা'জা নিজামউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি সেই অতি গোপন ঘটনা উদঘাটন করে তাঁর কাশফের (অন্তর্দৃষ্টি) প্রখরতা প্রমাণ করলেন। এখন আমরা অকপট বাক্যে স্বীকার করছি যে, হ্যা, দরবেশী এমনই হওয়া উচিত যা হযরত খা'জা হাসিল করে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন।

হযরত খা'জা মাহবুবে ইলাহি যিকরুল্লাহ বিল খায়ের বললেন, আমি আমার পীর ও মুর্শেদ শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মুখে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, বাগদাদের পথে "কাহাফ" মসজিদে একবার হযরত শায়খ আহাদউদ্দিন কিরমানী রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং সেই সময়ের কয়েকজন প্রখ্যাত সূফীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তাঁরা তখন আলোচনা করছিলেন, আদম সন্তানদের নিয়ে অর্থাৎ মানব সন্তানদের চেহারা, কাঠামো ও অন্যান্য দিক একজনেরটা অপর জনের অনুরূপ নয় কেন? হযরত শায়খ আহাদউদ্দিন কিরমানী (রহঃ) বললেন, 'আল আছারে আম্বিয়া' কিতাবে লেখা দেখেছি, আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্বাছ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করা হয়েছিলো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলাইহিস সাল্লামকে কেমন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যার জন্য তাঁর পরবর্তী বংশধরগণের চেহারা ও অন্যান্য দিক ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে? আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'হে আব্দুল্লাহ বিন্ আব্বাছ, হক সোবহানা তায়ালা আদম আলাইহিস্ সালামের মুখ মন্ডল কাবা শরীফের মাটি হতে, মাথা বায়তুল মোকাদ্দসের মাটি হতে, সম্পূর্ণ দেহের আচ্ছাদন বেহেস্তের মাটি হতে, চিবুক কাউসারের মাটি হতে, নাক, কান ও চোখ পৃথিবীর মাটি হতে, পা হিন্দের মাটি হতে, মাংসপেশী ও শিরা সমূহ দীপাঞ্চলের মাটি হতে তৈরি করেছেন। হে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাছ আল্লাহ তায়ালা যদি আদম

আলাইহিস সালামকে এক যায়গার মাটি হতে পয়দা করতেন তাহলে তাঁর আউলাদ একই রকম হতো এবং একজনের সঙ্গে অপরজনের পার্থক্য করা যেতো না।

হযরত খা'জা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের বললেন, হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে যখন শ্রীলংকার পাহাড়ের উপর নামানো হলো তখন তিনি সেখানে বসে এক বিরহ বেদনায় কাঁদতে আরম্ভ করলেন এবং এভাবে কাঁদতে লাগলেন যে তার প্রতিক্রিয়া পাহাড় ও পাথরের উপরও প্রভাব বিস্তার করলো। তারাও হযরত আদম আলাইহিস সালাম-এর কান্না দেখে কাঁদতে লাগলো। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য লাল ইয়াকুতের (মহামূল্যবান চুনী বা Ruby পাথর) ঘর বেহেস্ত হতে দুনিয়ায় বর্তমানে যে স্থানে কাবা ঘর অবস্থিত সেই স্থানে সংস্থাপন করলেন। এ ঘরটিই পৃথিবীর বুকে প্রথম ও আদি কাবা ঘর। এরপর আল্লাহ তায়ালা সে ঘর হযরত আদম আলাইহিস সালামকে যিয়ারত করার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং ফেরেস্তাদেরকে হুকুম দিলেন, আদম আলাইহিস সালাম কাবা ঘর যেয়ারতে এলে তাঁকে হজ্জ্ব করার নিয়ম কানুন শিখিয়ে দিও। হযরত আদম আলাইহিস সালাম নির্দেশ পেয়ে হজ্জ্ব করলেন এবং ঐ নিয়মে প্রতি বছরই তিনি হজ্জ্ব করতেন। নূহ আলাইহিস সালাম-এর সময়ে যখন প্রলয় হয় তখন সেই ইয়াকুতের কাবা ঘরটি চতুর্থ আসমানে প্রকৃত ও মূল কাবা ঘরের সম্মুখে তুলে নিয়ে রাখা হয়। ৭০,০০০ ফেরেস্তা প্রতিদিন সেটাকে তওয়াফ্ করে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা একই ভাবে তওয়াফ্ করতে থাকবে।

এরপর বললেন যখন কারও কর্ম, কামালিয়াত বা পূর্ণতায় পৌঁছে তখন যেখানে আল্লাহ তায়ালার "বালা'র খা'জানা (অর্থাৎ যেথা হতে দুঃখ দুর্দশা ও বিপদাপদ প্রেরিত হয় সে স্থান বা ভান্ডার) বিদ্যমান, সে স্থানে ঐ লোকটির নাম লিখিত হয়, এ জন্য যে তাঁর প্রেমের আকর্ষণ যাচাই করা হবে ঐ 'বালা' তার উপর কঠিন হতে কঠিনতম ভাবে নাজেল করে। যদি সে বাস্তাবিকই প্রেমিক ও কামেল হয় তাহলে সে ঐ সব নাজেলকৃত বালা সানন্দে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে হজম করে ফেলবে টু শব্দটি পর্যন্ত কেউ শুনতে পাবে না। এ ছাড়াও সে প্রার্থনা করবে- هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ - আরও অধিকের জন্য। এরপর তিনি তাঁর মুর্শেদের একটা ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করতে যেয়ে বললেন যে, তিনি বলেছিলেন, বোখারা সফরের সময় এক বুজুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো, তিনি এক গুহায় ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন। একাধারে তিনি যেমন পবিত্র অন্তরের অধিকারী ছিলেন, তেমনি ছিলেন আল্লাহ্ জাল্লে শানহুর নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত। অপরদিকে তিনি যেমন নফসকে বশ করেছিলেন, তেমনি শ্রেষ্ঠত্বের দিকেও

ছিলেন অদ্বিতীয়। হযরত শায়খ ফরিদুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, যখন আমি তাঁর কদমবুসি লাভ করলাম তখন তিনি আমাকে বসার জন্য নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেয়ে আমি বসলাম। লক্ষ্য করলাম একটা পবিত্র আলো তাঁর চেহারায় চমকাচ্ছে। আমাকে বললেন, হে ফরীদ, ৬০ বছর যাবৎ আমি এ গুহায় বাস করছি প্রত্যেক দিন আমার প্রতি বিভিন্ন ধরণের 'বালা' নাজেল হয়, আমি সেগুলো অত্যন্ত পুলকিত অন্তরে গ্রহণ করি। আর যেদিন আমার প্রতি বালা নাজেল হয় না সেদিন বালা নাজেল হওয়ার জন্য হাজার বার প্রার্থনা করি। কেননা বালা মুহাব্বত যাচাইয়ের কষ্টিপাথর। আমি জানি যে দুঃখ যাতনায় ধৈর্য ধারণ করলে প্রেম লাভ হয় এবং সে জন্যই বালাকে অধিক কামনা করি। হে ফরীদ এ পথই প্রকৃত চলার পথ। যে ব্যক্তি যথার্থভাবে এ পথে পদচারণা করছে এবং আল্লাহ্‌র পথের প্রেমিক বলে নিজে দাবী করে বা মনে করে, 'বালা' তাকে খুঁজে বের করে তার প্রতি আপতিত হয়। সুতরাং কর্তব্য হচ্ছে যথার্থভাবে ধৈর্যধারণ করা। হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের এ ঘটনা বলতে বলতে থেমে গেলেন। তারপর নিম্নোক্ত রুবাই (কবিতার পংক্তি) আবৃত্তি করলেন।

در عشق همه در دو جفا ها باشد
واندر ره عشق بلاها باشد
پس مردهم اوست در ره عشق که او
پیوسته بعشق در جفاها باشد ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ

দর ইশকে হামা দর দু জাফাহা বাশাদ
ও য়ান্দার রাহে ইশক বালাহা বাশাদ
মরদে হামউস্ত দর রাহে ইশক কে উ
পিয়ুস্তা বাইশক দর জাহাফা বাশাদ

বাংলা অর্থ ঃ

দুঃখ ও বেদনাতেই প্রেম লভি মোরা,
প্রেমের পথেই রয়েছে দুঃখ বেদনা।
তারই মাঝে মোরা বীর প্রেমেতে,
যে রূপ পোড়ায় ইট পাঁজার মাঝে,
প্রেম সে তো নিমজ্জিত মহা সমুদ্রে
দুঃখ ও বেদনার গহীন তলে।

এরপর বললেন, হযরত খা'জা বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, দুনিয়ায় আল্লাহ্ তায়ালা অলিদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন–

يَفْعَلُ اللّٰهُ بِاَوْلِيَائِهٖ فِى الدَّارِ الدُّنْيَا
مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِاَعْدَائِهٖ فِى الدَّارِ الْعُقْبٰى -

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করে থাকেন যেরূপ তিনি তাঁর শত্রুদের সঙ্গে পরকালে করবেন। অর্থাৎ এ বিলীনযোগ্য পৃথিবীতে তিনি তাঁর বন্ধুগণকে দোজখ বাসীর ন্যায় দুঃখ যাতনায় পরিবেষ্টিত করে রাখেন।

এরপর হযরত শিবলী রহমতুল্লাহি আলাইহি এর একটা ঘটনা বললেন; হযরত শিবলী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর (আল্লাহ তায়ালার করুণা বর্ষিত হোক তাঁর উপর) বাসনা ছিলো শয়তানকে দেখবে। এক রাতে স্বপ্নে শয়তান তাঁকে দেখা দিলে তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। শয়তান বললো ভয় পাবেন না, আমি ইবলিস। শায়খ শিবলী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন, তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলো, আল্লাহ্ পাকের অলিদের উপর তোমার কু-কর্ম চলে কিনা? উত্তরে ইবলিস (আল্লাহর অভিসম্পাত হোক তার উপর) বলেছিলো হ্যা, চলে কোন বিশেষ অবস্থায়, যেমন সামার মাহফিলে যখন সে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও সন্তুষ্টিতে গান শ্রবণ করে, তখন তাঁর অন্তর অমনোযোগী হয়ে পড়ে, তখন আমি আমার কর্ম চালিয়ে তাকে পরাস্ত করি।

মুমেনের অন্তরে দুঃখ দেয়া সম্বন্ধে হুজুর বললেন যে, মুমেনের অন্তরে দুঃখ দেয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালাকে দুঃখ দেয়া। হে দরবেশগণ! মুমেন সেই ব্যক্তি যে পূর্ব প্রান্তে বাস করলেও পশ্চিম প্রান্তের ভাই যদি দুঃখে পতিত হয়, তাহলেও সে ব্যথিত হবে এবং দুঃখ লাঘবের চেষ্ট করবে।

এক বুজুর্গ হযরত খা'জা খিজির আলাইহিস ছালাম-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মুসলমানদেরকে দুঃখ দেয়া কেমন কাজ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, মুসলমানকে দুঃখ দেয়া আর আল্লাহ্ তায়ালাকে দুঃখ দেয়া একই কথা। আমি হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্সালাম এর নিকট শুনেছি, তিনি

বলেছিলেন, যে ব্যক্তি মুসলমানকে দুঃখ দিলো, সে যেন আমাকেই দুঃখ দিলো, আর যে আমাকে দুঃখ দিলো সে যেন হক সোবহানা তায়ালাকেই দুঃখ দিলো। দ্বিতীয়তঃ মোমেনকে কষ্ট দানকরী ব্যক্তি পবিত্র কাবাঘর ধ্বংসকারীদের মধ্যে গণ্য হয়।

এরপর পরনিন্দা, পরচর্চা ও চোগলখুরী সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বললেন যে, এ সব অত্যন্ত জঘন্য, হীন ও নীচ কাজ। যেদিন হযরত ইউসূফ আলাইহিস্ সালামকে তাঁর সহোদর ভাইগণ তাঁকে কূঁয়ায় নিক্ষেপ করে একটা নেকড়ে বাঘ ধরে পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম-এর নিকট যেয়ে বলেছিলো এই নেকড়েটা ইউসূফ আলাইহিস্ সালামকে মেরে ফেলেছে যেদিন হযরত ইউসূফ আলাইহিস্ সালাম সেই নেকড়েকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তুই কি আমার ইউসূফ আলাইহিস্ সালামকে হত্যা করেছিস? আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে বাক শক্তি পেয়ে বাঘ বলেছিলো, না, তিনি দ্বিতীয়বার তাকে প্রশ্ন করলেন, তুই কি জানিস্ ইউসূফ কোথায় আছে? সে উত্তর দিলো, হে হযরত আমার জানা নেই। আমি যদিও পশু তবু পরনিন্দা বা অপরের দোষ ত্রুটি প্রকাশ করতে জানি না। হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শবে মিরাযে উর্ধ্বলোকে দেখলেন কিছু সংখ্যক গোনাহ্গার লোক, যাদের অপরাধের জন্য জিহ্বা ফুটো করে দেয়া হয়েছিলো এবং রগগুলো ঝুলছিলো। হযরত রেসালতে পানাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? জিব্রীল আলাইহিস সালাম উত্তরে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরা পরনিন্দা ও পরচর্চাকারী ছিলো।

এরপর হযরত খা'জা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের বললেন, পবিত্র কাবা ঘরে একটা পাথর আছে তাকে হাযরে আসওয়াদ বা কালো পাথর বলা হয়। বর্ণিত আছে যে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই পাথরটাকে চুমু খেতেন এবং পবিত্র ঠোঁট সেটায় লাগাতেন। এরপর বললেন হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে একবার দর্শন করেছে বা করবে তাঁর সত্তর বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং বেহেস্তী হিসেবে নির্বাচিত হবে এবং হাযরে আসওয়াদ সম্বন্ধেও অনুরূপ বিধান রয়েছে।

এক বুজুর্গ ব্যক্তি ইবলিসকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার অভিশপ্ত হওয়ার কারণ কি? উত্তরে সে বলেছিলো, যে দিন আল্লাহ্ তায়ালা দোজখ সৃষ্টি করলেন তখন আমি এবং আরও সত্তর হাজার ফেরেস্তা সেটা দেখতে গেলাম। দোযখে কিছু সংখ্যক উচ্চবেদী ছিলো যার মধ্যে একটা ছিলো সব চেয়ে বড়। দো'যখের

দারোগা মালেককে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার জন্য? উত্তরে সে বললো, তার নাম আমি জানি না, তবে এটা জানি যে সে একজন ফেরেস্তা এবং আল্লাহ তায়ালার অভিশপ্ত হবে। এ কথা শ্রবণ করার পর আমি সেটার উপর আরোহন করলাম এবং আমার মনে হলো ওটা আমরই জন্য। আমি অভিশপ্ত হওয়ার গোড়ার কাথা এটাই, কেননা আল্লাহ তায়ালার রহমতকে আমি উপেক্ষা করেছিলাম। পরবর্তী সময়ে আমার অভিশপ্ত হওয়ার কারণ সকলেরই জানা।

পরবর্তী আলোচনা আয়ুব আলাইহিস সালাম সম্বন্ধে ছিলো। হুজুর বললেন, হযরত আয়ুব আলাইহিস্ সালাম দোয়া চেয়েছিলেন, ইয়া ইলাহি আমাকে বার হাজার ভাষার জ্ঞান দান করো, যাতে প্রত্যেক ভাষায় তোমাকে স্মরণ করতে পরি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন এবং তাঁর শরীর কীট দ্বারা ভক্ষণ করানোর মতো দুঃখ প্রদান করেছিলেন। তাঁর শরীরে ১২০০০ কীট নিক্ষেপ করেছিলেন এবং প্রত্যেকটি কীটই আল্লাহ করুণাময়ের নাম জপ করতো। ঘটনা এ পর্যন্ত বলার পর হযরত খা'জা যিকরুল্লাহ্ বিল খায়ের একটু থামলেন। তাঁর চোখের পাতা অশ্রুতে ভিজে উঠলো। তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম ও আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ তায়ালার দুঃখ যাতনাকে আকাঙ্খার সাথে চেয়েছেন, তারপর তাঁরা পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়েছেন।

হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম-এর কথা বলতে যেয়ে বললেন যে, তিনি একদিন মোনাজাতে বলেছিলেন, হে ইলাহি কোন প্রকারেই কেহ ইবাদত দ্বারা তোমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না যে পর্যন্ত না তুমি তাঁর প্রতি বালা নাজেল করো! সুতরাং হযরত যাকারিয়া আলাইহি সালাম-এর উপরও বালা নাজেল হলো এবং সে বালা ছিলো হাজার দঁতের করাত, যা তাঁর মাথার উপর রেখে তাঁকে দিখন্ডিত না করা পর্যন্ত তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং এ ভাবেই তিনি তাঁর মনজিলে মাকসুদে পৌঁছেছিলেন।

হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম সম্বন্ধে বললেন যে, তিনি একবার আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরজ করেছিলেন, ইয়া বারে ইলাহি প্রাণ বাঁচাবার জন্য খাবারের মেহমান অনেক রয়েছে কিন্তু প্রাণের অনুসন্ধানকারী মেহমান নেই। আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ এলো, "হে ইব্রাহিম, যে পর্যন্ত তোমাকে দুঃখের কষ্টি পাথরে যাচাই না করবো সে পর্যন্ত তোমাকেও প্রেমিক ভাববো না।" হে দরবেশগণ, এ জন্যই বলি যে এ পথে শুধু দুঃখ আর দুঃখ। কৃতীবান বীর পুরুষ তারাই যারা এ দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট-যাতনাতে অবিচল থেকে এ বালাকে বন্ধুর প্রেমের পরশ মনে করে।

একবার এক আরিফ দুঃখ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বললো, ইয়া বারে ইলাহি, আমার সীমিত শক্তি তোমার দেয়া বালা-মুসিবত সহ্য করতে অপারগ। অতএব কৃপা করে এ যন্ত্রণা লাঘব করো। সাথে সাথে ইলাহির ফরমান হলো, 'যদি এ নিয়ামত গ্রহণ করার শক্তি না থাকে তা হলে এ পথ হতে সরে পড় এবং এ নিয়ামত অন্য কাউকে দান করছি।' হযরত খাজা যিকরুল্লাহ্ বিল খায়ের এ ঘটনা বলার পর তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি পুনরায় বললেন যে, আমি নিম্নোক্ত কবিতা পংক্তি দুটো এক দরবেশের মুখে শুনেছিলাম।

داری سرما وگر نه دو راز برما
ما دوست کشیم تونداری سرما

বাংলায় উচ্চারণ ঃ দারি সরেমা ও গরনা দো রাজ বরে মা
মা দোস্ত কুশিম তু নিদারি সরেমা

অর্থ ঃ কামনা মোর দুঃখ বেদনা না হয় দাও তা মোর পূণ্যেরই ফল হতে
বন্ধু নও, যদি না পূরাও মোর বাসনা, মেরে ফেলে মোরে।

এরপর ইরশাদ করলেন, কোন এক সময়ে এক বেদুইন (মরুভূমির যাযাবর) চার বছর বয়স পর্যন্ত উলঙ্গ কয়েকজন শিশুসহ পথ চলছিলো। তারা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর ছিলো। কয়েক দিন পেটে কোন প্রকার আহার পড়েনি যার ফলে পেট পিঠের সাথে মিশে গিয়েছিলো। বেদুইন তার ঝুলিটি পাথর দ্বারা ভর্তি করে পবিত্র কাবা ঘরের সম্মুখে এসে রাগান্বিত হয়ে বলতে লাগলো, "আমার ও আমার শিশুদের জন্য খাবার চাই, না পেলে এ পাথর দ্বারা তোমার কাবা ঘরকে নষ্ট করে দিব। সাথে সাথে পবিত্র কাবা ঘরের অলিন্দ হতে বের হয়ে এলো একটা হাত, সে হাতের মধ্যে ছিরো স্বর্ণ মুদ্রা ভর্তি একটি থলে। থলে তার সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হলে সে বললো, এ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে আমি কি করবো? আমার প্রয়োজন তো শুধুমাত্র দু'টো রুটির। এরপর দেখা গেলো স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে তার জন্য রুটি নিক্ষিপ্ত হলো। সে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়ে তার শিশুদের নিয়ে আহার করলো। দূরে দাঁড়িয়ে একটি লোক এ দৃশ্য দেখছিলো। তাদের আহার শেষ হলে সে লোকটি এসে বেদুইনকে ধিক্কার দিয়ে বললো, এটা তুমি কেমন বোকার মতো কাজ করলে? এক থলি আশরাফি গ্রহণ না করে গ্রহণ করলে মাত্র দুটো রুটি। বেদুইন উত্তরে বললো, আমার আকাঙ্খা অধিক ছিলো না। আমার বাসনা ছিলো, দু'টো রুটি খেয়ে আল্লাহ্ পাকের 'নিমক' আদায় করবো।

হযরত খাজা এ ঘটনা বর্ণনা করতে করতে কেঁদে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন, 'নিমক-এর অত্যন্ত বড় হক (দাবী) রয়েছে। মানুষের উচিত আল্লাহ্ করুণাময়ের 'নিমক' এর হক দৃষ্টির অন্তরাল না করা'।

পরবর্তী আলোচনা পরদা পুশী সম্বন্ধে শুরু হলো। হুজুর ইরশাদ করলেন, হযরত শীশ আলাইহিস্ সালাম-এর সময়ে এক ব্যক্তির একটা গাধা হারিয়ে গিয়েছিলো। সে অনেক খোঁজ করার পর গাধা না পেয়ে হযরত শীশ আলাইহিস্ সালাম-এর নিকট গমন করে আরজ করলো গাধাটি ফিরে পাওয়ার জন্য। তিনি সাত অহোরাত্র লোকটির জন্য দোয়া করলেন যাতে সে গাধাটি ফিরে পায়। কিন্তু গাধাটি পাওয়া গেলো না। সপ্তমদিন হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালাম হযরত শীশ আলাইহিস্ সালাম-এর নিকট অবতরণ করে বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা নির্দেশে বলেছেন, তিনি পর্দাপুশ অর্থাৎ গোপন রয়েছেন। তাই কারও পর্দা উন্মোচন করতে চান না। অতএব আপনি হাত গুটিয়ে ফেলুন, আপনার এ দোয়া কবুল হবে না। এ ঘটনা বলতে বলতে হযরত খাজার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেলো। তিনি বলতে লাগলেন যে, দরবেশদের পর্দাপুশী করা উচিত। কেন না সুলুকের পথে পর্দাপুশী হচ্ছে সকল ইবাদত হতে শ্রেষ্ঠতম। পর্দাপুশীর অর্থ হচ্ছে অপরের দোষত্রুটি দেখলে তা গোপন রাখা অর্থাৎ কারও একটি দোষও প্রকাশ না করা এবং এ গুণটি হচ্ছে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালার। দরবেশদের উচিত আল্লাহ্ তায়ালার গুণের সাথে নিজেদেরকে সম্পর্কযুক্ত করা।

পরবর্তী আলোচনা চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে আরম্ভ হলো। চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে তিনি বললেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাশের খিলানের নীচে দু'ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তারা তাঁর কিছু উম্মত সম্বন্ধে অভিযোগ করে আল্লাহ্ পাকের দরবারে বলছে যে, ইয়া ইলাহি আমরা তাদের পাপে অসহ্য হয়ে উঠেছি। এখন শুধু তোমার হুকুমের অপেক্ষা করছি। যদি হুকুম দাও তো তাদেরকে ধ্বংস করে দিই। সাথে সাথে আল্লাহ্ তায়ালার ফরমান হলো, আমি তোমাদের দু'জন হতে অধিক দেখছি ও এ সম্বন্ধে জ্ঞান রাখি। তাদের কোন গুনাহ আমার অগোচর নেই। তোমাদের এ ব্যাপারে নাক গলাবার প্রয়োজন নেই, সে জন্য আমিই যথেষ্ট। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। যখন তিনি আল্লাহ্ পাকের ঐ নির্দেশ শ্রবণ করলেন তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে চন্দ্র ও সূর্যের অস্তিত্বের ঝুটি টেনে ধরলেন এবং ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে তাদের প্রতি তাকালেন। সাথে সাথে সূর্য ও চন্দ্রের আলো বন্ধ হয়ে গেলো। দোযখের দারোগা মালেক সেখানে উপস্থিত ছিলো। তিনি সূর্য ও চন্দ্রের অস্তিত্বকে মালেকের হেফাজতে রেখে বললেন এদের মুখ উপরের দিকে ঘুরিয়ে রাখো যাতে উপরে

বসবাসকারীরা এদের স্বরূপ বুঝতে পারে এবং তিনি উর্ধ্ব লোকে গমন করলেন। দুনিয়াতেও এরূপ নিয়ম বিদ্যমান রয়েছে যারা চোগলখুরী ও অপরের গীবত করে তাদের মুখে চুনকালী মেখে অলিগলি ও বাজারে ঘুরানো হয়। অবশেষে হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজ শেষে ফেরার পথে যখন ওদের সম্মুখ দিয়ে আসছিলেন, তখন চন্দ্র ও সূর্যের সত্তা দৌড়ে এসে তাঁর পবিত্র পদপল্লবে লুটিয়ে পড়ে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আপনার মহানুভবতা ও শ্রেষ্ঠত্ব হতে আমাদের জন্য দোয়া করুন যাতে আমরা ক্ষমা পাই। আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। আমরা তওবা করছি ভবিষ্যতে আর কখনও কারও বিরুদ্ধে চোগলখুরী বা কারও গীবত করবো না। হযরত রেছালতে পানাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়াপরবশ হয়ে তাদের জন্য পরম করুণাময়ের দরবারে দোয়া করলেন। সাথে সাথে তাদের অস্তিত্ব আলোকিত হয়ে উঠলো।

হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের বললেন, আমি হাদীস শরীফে লিখা দেখেছি, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আমার প্রতি (প্রতিদিন) পবিত্র অন্তকরণে ১ বার দরূদ পাঠায় তার সারা জীবনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। হাশরের দিন এর বদলায় পুলছেরাত পার হওয়ার জন্য তাকে একটা নূর দেয়া হবে, অবশ্য যদি তা কবুল হয়। এরপর বললেন হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর দেহ পয়দা করে যখন রুহ দ্বারা জীবন্ত করা হলো, তখন হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহাপবিত্র নূর তাঁর পবিত্র স্কন্ধ ও মস্তকের মিলন স্থলে রাখা হয়েছিলো এবং তারপর ফেরেস্তাদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছিলো, "হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সেজদা করো" এ ঘটনা হতেই মুফাস্সিরগণ প্রমাণ করেন যে প্রকৃত রূপে ফেরেস্তাগণ সেজদা আদম আলাইহিস্ সালামকে করেন নি বরং তারা নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করেছিলো।

এরপর হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে মোনাজাত করলেন, ইয়া বারে ইলাহি, আমাকে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখাও। তাঁর দোয়া কবুল হলে সেই নূর তাঁর পূর্ব স্থান হতে পেশানী (কপাল) মোবারকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিলো বেহেস্তের হুরগণ সে নূর দেখার পর নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেছিলো এবং অষ্টপ্রহর অহর্নিশীতে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর খেদমতে হাজির থাকতো। এরপর হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম দোয়া

চাইলেন, ইয়া ইলাহি এ রূপে নূরে মুহম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দর্শন করে তৃষ্ণা নিবৃত্ত হচ্ছো না, দয়া করে পেশানী হতে এ নূরকে স্থানান্তরিত করে এমন জায়গায় সংস্থাপন করুন যাতে আমি দিবারাত্র সব সময় তাঁকে দেখতে পাই। আল্লাহ্ পাক তাঁর দোঁয়া কবুল করে সে নূর সেখানে থেকে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে স্থানান্তরিত করেছিলেন। বহুদিন পর্যন্ত নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেখানে রাখা হয়েছিলো। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম তাঁকে অপলক নয়নে অবলোকন করতেন এবং চুমু খেতেন। এরপর একদিন হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। নিদ্রা হতে জাগরিত হয়ে তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন যে, সে পরম ও পবিত্র নূর তাঁর নিকট হতে চলে গেছে। তিনি পাগলের মতো সে নূর বেহেস্তের এ প্রান্ত হতে সে প্রান্ত পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খোঁজতে লাগলেন, কিন্তু কোথাও পাচ্ছিলেন না। শেষ পযন্ত তিনি সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকট পৌছলেন.....। দেখলেন একটা দানার মধ্যে সে নূর জড়িয়ে আছে এবং জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। তিনি তখন সেই দানাটি খেয়ে ফেললেন, সাথে সাথে আওয়াজ হলো, তুমি তোমার মাকসূদে পৌছেছো, এ বার দুনিয়ায় গমন করো, কেননা সেখানেই তোমার মনস্কামনার পূর্ণ বিকাশ ও প্রকাশ হবে। সুতরাং আদম আলাইহিস্ সালামকে বেহেস্ত হতে দুনিয়ায় আগমন করতে হলো।

পূর্বে বর্ণিত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর দুনিয়ায় আগমনের ঘটনার পরিপূরক রূপে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন মুফাস্সিরগণ অর্থাৎ ব্যাখ্যাকারীগণ। ওয়াল্লাহু আলম বিস্সওয়াব।

হযরত খাজা যিকরুল্লাহ্ বিল খায়ের এ পর্যন্ত বলে নিশ্চুপ হয়ে ধ্যানস্ত হলেন। মজলিস আপাততঃ সমাপ্ত হলো।

–আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

দ্বিতীয় মজলিস

রোববার, ২৭ শে রজব, ৬৮৯ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। মাওলানা ফখরুদ্দীন জারাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি, মাওলানা বোরহানুদ্দিন গরীব রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং অন্যান্য সূফিগণ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। হযরত ইরশাদ করলেন, হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম এক হাজার বছর আয়ু পেয়েছিলেন এবং ৯৫০ বছর নবী রূপে দুনিয়ায় ছিলেন। এ সূদীর্ঘ সময়ে মাত্র ৭০ জন লোক তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছিলেন। এ ঘটনা 'কুতুবে কাসাস' গ্রন্থসমূহে এভাবে বর্ণিত আছে, একদিন তিনি তাঁর কওমের নিকট ওয়াজ করতেছিলেন, তাঁর কওম সে ওয়াজ শ্রবণ করে ভীষণভাবে ক্ষেপে যেয়ে তাঁর প্রতি এমনভাবে ইট পাটকেল ছুড়তে লাগলো যে তাঁর পিছনের দিকটা রক্তাক্ত হয়ে গেলো। তিনি সে ব্যথা সহ্য করতে না পেরে বক্তৃতার স্থান ত্যাগ করে বাড়িতে চলে এলেন এবং দোয়া চাইলেন, ইয়া বারে এরোহি, আমি ভীষণ কষ্টে আছি। তৎক্ষনাৎ হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম-উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন আল্লাহ্ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, "আমি দুনিয়াতে আম্বিয়া ও আউলিয়ার জন্য দুঃখ কষ্ট সৃষ্টি করেছি। যদি ধৈর্যধারণ করার মতো সামর্থ না থাকে তাহলে রেসালতের চাদর খুলে ফেলো এবং সেটা আমি এমন কাউকে দিয়ে দিই, যে আমার দেয়া দুঃখ-যাতনাকে সানন্দে গ্রহণ করবে"। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম যখন এ কথা শুনলেন, তখন আর শ্বাস ফেললেন না। পরবর্তী সময়ে যে সকল দুঃখ-দুর্দশা তাঁর উপর নিপতিত হয়েছে তিনি অধিক ধৈর্যের সঙ্গে সে সবের মোকাবেলা করেছেন। এমনকি তিনি বালা মুসিবতের জন্য উন্মুক্ত হয়ে থাকতেন। হযরত খাজা যিকরুল্লাহ্ বিল খায়ের এরপর বললেন, হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম-এর রীতি ছিলো প্রতি রাতে এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করা এবং ভোরের আলো বেরুবার আগে মাথা সেজদানবত করে অতি বিনয়ে বলতেন, ইয়া ইলাহি, আমি এমন কিছু ইবাদত করতে পারলাম না যা তোমার মনঃপূত হয় এবং এমন সেজদাও করতে পারলাম না যা তোমার উপযুক্ত হয়। আমি জানি না কাল কিয়ামতে আমার কি অবস্থা হবে। মোনাজাত শেষ করার পর তিনি এমনভাবে জেকেরে নিবিষ্ট হতেন যে, সে জেকেরের কাঠিন্যতায় তাঁর লোমকূপের মুখ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতো এবং সেই রক্তের ফোটা মাটিতে পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ নামের তসবীহ হয়ে যেতো। তিনি সারারাত

ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন আর সারাদিন তাঁর কওমকে হেদায়েত করতেন। এভাবেই তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত সময় ব্যয় করেছেন। তিনি কখনও নিয়মের সামান্যতম ব্যতিক্রম করেন নি।

মজলিসের এক ব্যক্তি এ সময় হঠাৎ করে বললেন হযরত, সাগর ও নদী এসব সৃষ্টির কারণ জানলে তৃপ্ত হতাম। উত্তরে হযরত নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করলেন।

নূহ আলাইহিস্ সালাম-এর কওমের উপর যখন তাঁর বাসনা অনুযায়ী আল্লাহ্ তায়ালার গজব নেমে এলো এবং সমস্ত কিছু পানিতে ডুবে গেলো–

কুরআন শরীফে আল্লাহ্ পাক বলেছেন।

فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ط
وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلٰى اَمْرٍ
قَدْ قُدِرَ-

জমিন হতে প্রথম পানির ফুয়ারার সৃষ্টি হলো। উক্ত আয়াতে প্রকাশ রয়েছে

وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا -

এবং সেটা এমন ছিল যে জমিন এবং পাহাড় পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলো। পানি ভূমি ও পাঁহাড়ের উপর দিয়ে এ জন্য প্রবাহিত হচ্ছিলো যে, প্রলয়ের আঘাত যেন জমিনে না লাগে এবং জমিন রক্ষা পায়। ৪০ দিন পর্যন্ত পানি বর্ষণ হতে থাকে। যদি সমস্ত ভূমি প্লাবিত না হতো তাহলে বর্ষণে জমিন ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো এবং বীজ বপন বা চাষাবাদের উপযুক্ত থাকতো না। পানির উচ্চতা পাহাড়কে অতিক্রম করে আরো ঊর্ধ্বে উঠেছিলো। তখন শুধু পানি আর পানি, তাছাড়া আর কিছুই ছিলো না। অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায় পানি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া অতিক্রম করে ৪০ হাত পর্যন্ত উপরে উঠেছিলো। একাধারে চল্লিশ দিন ঝড় তুফান হওয়ার পর ঝড় থেমে গেলো। তখন আল্লাহ্ তায়ালা আসমানকে হুকুম দিলেন তোমার বর্ষণ বন্ধ করো। এ সম্বন্ধে কুরআনে আয়াত–

يَاَرْضِ ابْلَعِى مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِىْ وَغِيْضَ
الْمَاءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِى وَقِيْلَ بُعْدًا
لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ -

জমিন তার নিজের পানি চুষে নিলো কিন্তু আসমান হতে যে পানি বর্ষিত হয়েছিলো সে পানি জমিন চুষে নিতে পারলো না। কারণ সে পানি ছিলো লবণাক্ত ও খারযুক্ত। আকাশের পানি লবণাক্ত হয়েছিলো আল্লাহ্ তায়ালার ক্রোধের কারণে। সে পানি যে স্থানে স্থায়ী হলো সে জায়গা সাগর ও সমুদ্র নামে অভিহিত হলো। যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালা হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম-এর মোনাজাত কবুল করেছিলেন। সেহেতু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে নির্মূল করার জন্য তিনি এ প্লাবন ও তুফান নাজেল করেছিলেন। তিনি তাঁর মোনাজাতে বলেছিলেন–

رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِىْ -

অর্থাৎ হে বারি তায়ালা আমার কওম না ফরমান হয়ে গেছে।

وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗ اِلَّا خَسَارًا -

তারা তাদেরকেই সম্মান করে যাদের নিকট ধন-দৌলত রয়েছে। এদের সন্তানদের নিকট হতেও কোন প্রকার ভালো কিছু আশা করা যায় না।

وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا -

গোমরাহী ব্যতীত জালেমদের নিকট হতে ভালো কিইবা আশা করা যায়? তারা কাফের ও পথভ্রষ্ট, আমার হেদায়েতে তারা সৎ পথে আসছেনা, ব্যাখ্যাকারীগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন।

যখন আল্লাহ্ তায়ালা প্রলয় তুফান পাঠাবেন, তার পূর্বে নূহ আলাইহিস্ সালামকে নির্দেশ পাঠিয়ে বললেন, আমি তুফান নাজেল করতে যাচ্ছি। সে তুফানে পথভ্রষ্টদেরকে ধ্বংস করা হবে। তুনি নিজের লোকদের জন্য নৌকা তৈরি করো। নূহ আলাইহিস্ সালাম আরজ করলেন, ইয়া ইলাহি আমি তো নৌকা বানাতে জানি না। হক সোবহানা তায়ালার হুকুম হলো, জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম তোমাকে নৌকা বানানো শিখিয়ে দিবে। হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম অবতরণ করে নূহ আলাইহিস্ সালামকে বললেন, আপনি আগে পরের ১,২৪,০০০ তক্তার ব্যবস্থা করুন এবং এক একটি তক্তার মধ্যে আগের ও পরের এক একজন নবীর নাম লিখুন। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম বললেন, আমি সব নবীর নাম জানি না।

এমন সময় আল্লাহ্ তায়ালার ফরমান এলো, "কাঠ চিরাই করার দায়িত্ব রইলো আপনার উপর আর পয়গম্বরদের নাম অঙ্কিত করার দায়িত্ব রইলো আমার

উপর। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম তক্তা চিরতে আরম্ভ করলেন। যখন প্রথম তক্তা চিরাই হয়ে বের হলো, তখন দেখা গেলো তার মধ্যে লেখা রয়েছে, আদম আলাইহিস্ সালাম। দ্বিতীয় তক্তায় শীশ আলাইহিস্ সালাম। তৃতীয় তক্তায় নূহ আলাইহিস্ সালাম এবং চতুর্থ তক্তায় দেখতে পেলেন ইদ্রিস আলাইহিস্ সালাম লেখা রয়েছে। এভাবে প্রত্যেকটি তক্তার মধ্যে এক একজন নবীর নাম লিখিত অবস্থায় বের হতে লাগলো। সর্বশেস তক্তার গায়ে দেখতে পেলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহ্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম লিখিত রয়েছে। এ সময় হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম নূহ আলাইহিস্ সালামকে বললেন— اَلْاٰنَ تَمَّتْ سَفِيْنَتُكَ অর্থাৎ এখন আপনার কিস্তি শেষ হলো। কেননা, হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী এবং আম্বিয়া ও আউলিয়াদের চেরাগ। এরপর এক লক্ষ চব্বিশ হাজার কালিন (কার্পেট) আসমান হতে নাজেল হলো। প্রত্যেক কালিনের ফুলের মধ্যেও এক একজন নবীর নাম লিখা ছিলো। অন্য এক রাওয়ায়েতে (বর্ণনায়) বর্ণিত আছে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামের পরেও চারটে তক্তা অবশিষ্ট ছিলো, যার মধ্যে কিছু লিখা ছিলো না। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জিব্রীল আলাইহিস্ সাল্লাম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি শেষ নবী হন, তাহলে এ চারটে তক্তার মধ্যে কাদের নাম লিখা হবে? হুকুম ছিলো পয়গম্বরদের নাম লেখার এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু শেষ নবী এবং তারপর আর যখন কেউ নবী হবে না সেহেতু ....। ঠিক তখনই ওহী এলো, হে নূহ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও চারজন বিশেষ আছহাবদের নাম ব্যতীত নৌকা পূর্ণ হবে না এবং ভাসবেও না। তিনি আরজ করলেন ইয়া ইলাহি, তাঁদের নাম কি কি? নির্দেশ হলো, হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুক, হযরত ওসমান গনী এবং হযরত আলী রাদি আল্লাহু আনহুম। অবশিষ্ট চারটি তক্তার প্রত্যেকটিতে এক এক জনের নাম লিখো। কেননা তাঁরা দুনিয়া ও আখেরাতে প্রখ্যাত। যদি এ চারজনের নাম না লিখো তাহলে তোমার নৌকা বাসনা পূরণে সমর্থ হবে না। নৌকার গলুই ও পাছার (সামনের ও পিছনের) কাঠ যখন বেরিয়ে এলো তখন দেখা গেলো তাতে লেখা রয়েছে শাব্বির ও শব্বর এবং মাস্তুলের তক্তার মধ্যে ফাতেমার নাম লেখা ছিলো। এরপর বললেন, যখন প্রলয়ের সময় নিকটবর্তী হলো তখন জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম অবতরণ করে বললেন, একটা মৃতের খাট বা শবাধার তৈরি

করুন। হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দাফন করা হয়েছে। সেখান থেকে তার দেহ উত্তোলন করে শবাধারে রেখে শবাধারটি নৌকায় তুলে নিন। তারপর হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম শবাধার তৈরি করলেন এবং হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর লাশ জমিন থেকে উত্তোলন করে সেই শবাধারে রাখলেন এবং শবাধারটি তাঁর নৌকায় তুলে নিলেন। হযরত খাজা এরপর এরশাদ করলেন, হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম-এর নৌকা শেষ হওয়ার পর দুনিয়ার প্রত্যেক প্রকারের বীজ ও চারা ও প্রত্যেক প্রাণীর এক একটি জোড়া নৌকায় সংরক্ষিত হলো। তারপর হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর শবাধারটি তাঁর নৌকায় সংরক্ষিত হওয়ার পর তুফান শুরু হলো। আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমে জমিন তার ভিতরের পানি উদ্গীরণ করতে লাগলো এবং আকাশ হতেও পানি প্রলয়ের সাথে অঝরে বর্ষণ হতে লাগলো। জমিন হতে পানির উচ্চতা দ্রুত বাড়তে লাগলো এবং বাড়তে বাড়তে এক সময় পাহাড়ের চূড়াও পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেলো। সমস্ত পথভ্রষ্টরা পানিতে ডুবে গেলো। অন্য এক বর্ণনায় আছে, পানি তিন দিন পর্যন্ত সর্বোচ্চ অবস্থায় স্থায়ী ছিলো।

এ প্রলয় ও প্লাবনে নৌকায় সংরক্ষিত বস্তু ও প্রাণী ছাড়া সকলেই ধ্বংস হলো। কিন্তু যাদের জন্য হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম দোয়া করেছিলেন তারা বেঁচে গিয়েছিলো। কুরআন শরীফে কথাটি এভাবে বর্ণিত আছে–

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا ـ

অর্থাৎ হে পরওয়ার দীগার ক্ষমা করো আমাকে ও আমার পিতা মাতাকে এবং সেই সব লোকদেরকে যারা আমার দ্বীনে এসেছে অর্থাৎ নৌকার মধ্যে আছে। এ দোয়ার মাধ্যমেই অবশিষ্টরা অর্থাৎ পথভ্রষ্টগণ আল্লাহ্র গজব হতে মুক্তি না পেয়ে ধ্বংস হলো।

উপরোক্ত দোয়া-ই উম্মতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সকল মুমেন মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ও আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামদেরকে কিয়ামতে দোযখের আগুন হতে মুক্তি দেবে।

এরপর ইরশাদ করলেন, তাফসীরের কিতাবে বর্ণিত আছে, যখন সমস্ত আকাশ-জমিনে প্রলয় ও প্লাবনে প্রাণী বাসের উপযোগী কোন স্থানই রইলো না তখন ইবলিস (আল্লাহ্র অভিশম্পাত হোক তার উপর) নূহ আলাইহিস্

সালাম-এর নৌকায় আশ্রয় নিলো। হজযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম তাকে দেখেই বের করে দিতে চাইলেন, কিন্তু ইলাহির ফরমান হলো, "ওকে বের করোনা" জগৎ ধ্বংস না হওয়া অবধি আমি তাকে আয়ু দান করেছি।" হযরত নূহ আলাইহিস সালাম যদিও তার আয়ু সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিলেন, তবু ভাবলেন যে ধর্মের দুশমন ডুবে শেষ হয়ে যাওয়াই ভালো। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ছিলো অন্য রকম। সুতরাং তার মৃত্যু হলো না, সে নিরাপদেই নূহ আলাইহিস সালাম-এর নৌকার মধ্যে বেঁচে রইলো।

এরপর হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবু তালেব সম্বন্ধে কথা উঠলো, এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, শুনেছি কিয়ামতে তিনি নাকি ক্ষমা পাবেন? হযরত খাজা বললেন, তুমি যা শুনেছো তা সত্যি। তিনি দোযখী হবেন না বরং বেহেশ্তী হবেন। হযরত শকিক বলখী রহমতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, একবার হযরত খিজির আলাইহিস্ সালাম-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলো আবু তালেবের বেহেস্তী হওয়া সম্বন্ধে। আমার প্রশ্নটি ছিলো এরূপ, শুনেছি কেয়ামতের দিন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবু তালেব দোযখী না হয়ে বেহেস্তী হবেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, হ্যাঁ, বেহেস্তী হবেন। কারণ আমি হযরত রেছালতে পানাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আবু তালেব বেহেস্তী হবেন।" শকিক বলখী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে বললেন, এর কোন কারণ বা দলিল প্রমাণাদি থাকলে বলুন না। হযরত খিজির আলাইহিস্ সালাম বললেন, তিনি মৃত্যুর সময় কাফের ছিলেন এ কথা সত্য, কিন্তু তার মৃত্যুতে ইবলিস ব্যথিত হয়ে পড়েছিলো। ইবলিসের এ ব্যথিত হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করায় সে বলেছিলো, যদিও সে দুনিয়া হতে কাফের হয়ে বিদায় নিলো কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে ঈমান এনে বেহেস্তী হবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, আবু তালেব ঈমান এনে বেহেস্তে যাবে। আর দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম শেষ জমানায় যখন দুনিয়ায় অবতরণ করবেন তখন মোজেযা হিসেবে মৃত ব্যক্তি হতে একজনকে জীবিত করবেন এবং সেই ব্যক্তি হচ্ছেন আবু তালেব। জীবিত হয়ে সে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর নিকট মুসলমান হয়ে কলেমা পড়বে–

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

এবং ঈমানের ঐশ্বর্য লাভ করে বেহেস্তে যাবেন। "নওয়াজিশ শোহায়ে" উল্লেখ আছে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্বন্ধে বলেছেন, আল্লাহ্ রাহমানুর রাহিম তাঁর দোয়ার বরকতে তাঁকে জীবিত করে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর বন্ধু বানাবেন ; যার বদৌলতে সে ঈমান আনবে এবং বেহেস্ত লাভ করবে।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো কিয়ামত সম্বন্ধে হযরত খাজা যিকরুল্লাহ্ বিল খায়ের ইরশাদ করলেন, কারো জানা নেই যে কিয়ামত কবে ঘটবে। এক রাওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়েছে, একবার হযরত খিজির আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো কিয়ামত কখন হবে? তিনি পাঁচ আঙ্গুল উত্তোলন করে ইশারা করেছিলেন। এ পাঁচ আঙ্গুলের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে বললে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তায়ালাই ভাল জানেন। সুতরাং এ রহস্য উদ্‌ঘাটন হয় নি। এরপর বললেন, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিবেদেন করা হয়েছিলো ঐ পাঁচ আঙ্গুলের তাৎপর্য কি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমার বয়স আর পাঁচ বছর বাকী রয়েছে। আমার বেছালের তারিখ হতে কিয়ামতই মনে করবে। কেননা শবে মি'রাজে আমাকে বলা হয়েছিলো, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত ব্যক্তির দিক হতে কিয়ামত তার মৃত্যু হতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আমার ইন্তেকাল তো তোমাদের জন্য এক কঠিন দুর্যোগ। কেননা ওহী বন্ধ হয়ে যাবে ও আসমানী কালাম আসা বন্ধ হয়ে যাবে।

اَلْمَوْتُ قِيَامَةُ الْقِيَامَةِ -

সুতরাং হে বন্ধুগণ বুঝে নাও যে এ মৃত্যুই হচ্ছে কিয়ামতে সুগরা (ছোট)। আর বৃহত্তর ও প্রধান কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে সে জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ জ্ঞাত নয়। কিন্তু শবে মিরাজে আমাকে বলা হয়েছিলো। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুমি তো আর দুনিয়াতে ১৫০০ বছর থাকছো না।

এরপরে আলোচনা হলো সালাত বা নামায সম্বন্ধে। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, যখন মানুষ নামাযে নিমগ্ন হয় তখন তার ভুলে যাওয়া আগে ও পরের কথা মনে পড়ার কারণ কি? আমি হাদিস শরীফে লেখা দেখেছি اَلصَّلٰوةُ نُوْرٌ - আচ্ছালাতু নুরুন অর্থাৎ নামায হচ্ছে নূর বা আলো। সুতরাং আলোকে দৃশ্য অদৃশ্য, প্রকাশ্য ও গোপন, স্মৃত ও বিস্মৃত সকল বস্তু, ঘটনা ও ব্যাপার হৃদয়-পটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে সুতরাং সাধারণ মানুষ তার স্তর ও পর্যায়ক্রমের উপর নির্ভর করে সে আলোকে সে কি দেখবে বা দেখবে না। একজন সাধারণ ও দুনিয়ার লোক দুনিয়ার মাঝে দুনিয়াকে নিয়েই ডুবে থাকে। তাই সেই সালাতে বা

নামাযের আলোতে সে দেখতে পায় তার অভাব অভিযোগ ও কল্পনার বস্তুকে। বিভিন্ন অবস্থা, বিভিন্ন মানুষের নিকট বিভিন্নভাবে নামাযের আলোতে দৃষ্ট হয় তার কাংখিত বস্তু। কিন্তু নামায শুধু স্রষ্টার জন্যই এবং প্রকৃত নামাযে মেরাজ হয়। হাদিস শরীফে আছে–

اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

"আস্‌সালাতো মেরাজুল মু'মেনীনা" অর্থাৎ মোমেনের নামাযের আলোতে মেরাজ লাভ হয় এবং কুরআনে পাকে আছে–

وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَادَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْالِىْ وَلْيُؤْمِنُوْابِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ -

ওয়া এজা সায়ালাকা ইবাদী আন্নি ফা আন্নি কারিবুন উজিবু দা'ওয়া তাদ্‌দায়ে ইজা দায়ানে ফাল ইয়াস তাজিবু লি ওয়াল ইউ'মিনু বি লাআল্লাহুম ইয়ার শুদুন। (হে রাসূল) আমার ইবাদতকারী যখন আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে (আপনি বলে দিন) আমি তাদের নিকটেই আছি। তারা যখন আমাকে আহ্বান করে আমি সাথে সাথে তাদের আহ্বানে সাড়া দিই। এবং তাদেরকেও আমি আমন্ত্রণ জানাই আমার কাছে আসার জন্য। হযরত খাজা শকীক বলখী রাহাতুমাল্লাহি আলাইহিকে– اَلصَّلٰوةُ نُوْرٌ - আস্‌সালাতু নুরুন। এর ব্যাখ্যা করতে বলা হলে, তিনি বললেন, নামায হচ্ছে আলোকপিন্ড যার উজ্জ্বল্যে এক দিগন্ত হতে অপর দিগন্ত পর্যন্ত ঝলমল করে। এ নূর দৃশ্য অদৃশ্য কোন কিছুকে গোপন থাকতে দেয় না। এক বুযুর্গ বলেছেন, আমি যখন নামাযে নিমগ্ন হই তখন উর্ধ্ব-লোকের হেজাবে আযমত (প্রধান বা শেষ পর্দা) হতে মাটির তলদেশের শেষ স্তর (তাহ্‌তে আছরা) পর্যন্ত সমস্ত কিছু আমার নামাযের আলোত উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং আমি তা দেখতে পাই।

পরবর্তী আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো রজব মাস ও খাজা ওয়ায়েস করনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নামায সম্বন্ধে। হুযুর বললেন, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ঈমানদার ব্যক্তি রজব মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখবে তার বেহেস্তে প্রবেশের জন্য আমি জিম্মাদার আছি। এরপর হযরত খাজা বললেন, ২৭শে রজব "নামাযে খাজা ওয়ায়েস করনী" পড়া উচিত। অর্থাৎ ২৭শে রজব হযরত ওয়ায়েস করনী যেভাবে নামায পড়েছেন সে ভাবে ও নিয়মে পড়া উচিত। [২৬ তারিখের দিবাগত রাতকে শবে মিরাজের রাত বলা হয়]

নামায ও নামাযের নিয়ম

নামাজ ঃ বার রাকাত, তিন সালামে ও তিন নিয়তে।

১ম চার রাকাত ঃ কোন নির্দিষ্ট সূরা কারাত নেই। সাধারণ নিয়মে পড়লেই চলবে। সালাম শেষে ৭০ বার এ দোয়া পাঠ করবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ -

উচ্চারণ ঃ লা-ই লাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবিন।

২য় চার রাকাত ঃ প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা নাস একবার করে পাঠ করবে। সালাম শেষে এ দোয়া ৭০ বার পাঠ করতে হবে।

اَقْوٰى مُعِيْنٌ وَاَهْدٰى دَلِيْلٌ بِحَقِّ
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

আকওয়া মুইনুন ওয়া আহদী দলিলিন বেহাক্কে ইয়া কানা'বুদু ওয়া এ ইয়্যা কানাস তাইন।

শেষ চার রাকাত ঃ প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস ৩ বার করে পাঠ করতে হবে। নামায শেষে ৭০ বার সূরা। اَلَمْ نَشْرَحْ ইনশারাহ।

অর্থাৎ আলাম নাশরাহ্ তসমিয়ার (বিছমিল্লাহ্) সঙ্গে পাঠ করবে।

তারপর সিনার উপর হাত রেখে দোয়া চাইবে ইন্‌শাল্লাহ নৈকট্য লাভ হবে। এরপর ইরশাদ করলেন, আমি আমার মুর্শেদ শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর পবিত্র মুখে শুনেছি, তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি ২৭শে রজব রোযা রেখে 'সালাতে ওয়ায়েস করনী' অর্থাৎ উপরোক্ত নিয়মে নামায পড়বে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করবেন। এরপর বললেন, অন্য এক রাওয়ায়েতে ২৭শে রজব যোহরের নামায পড়ার পর চার রাকাত নফল নামায পড়ার বিধান রয়েছে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা নাস ১ বার, সূরা

ফালাক ১বার, সূরা ক্বদর ৩ বার ও সূরা ইখলাস ৫০ বার এবং সালামের পর আসর পর্যন্ত ধ্যনস্ত অবস্থায় বসে দোয়া চাইতে থাকবে। এর গুণাগুণ মহৌষধের মতো কাজ করে। এ সময়ের দোয়া ইনশাল্লাহ অবশ্যই কবুল হয়। আমি শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মুখে শুনেছি, তিনি বলতেন 'রায়হান' কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যে ব্যক্তি ২৭ শে রজব ১২ রাকাত নামায ১ সালামে পাঠ করবে এবং সালামের পর কালেমা তামজীদ ১০০ বার, আস্তাগফার ১০০ বার ও দরূদ শরীফ ১০০ বার পড়ার পর সেজদায় যেয়ে করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালার নিকট যা প্রার্থনা করবে আল্লাহ্ রাহমানুর রাহিম অবশ্যই তাঁকে তা দান করবেন। এ নামাযের জন্য নির্দিষ্ট কোন সূরা ক্বিরাত নেই, ইচ্ছা মতো যে কোন সূরা ক্বিরাত ব্যবহার করা চলবে।

এরপর বললেন আল্লাহ্র অলিগণ ২৭শে রজবের রাতকে জীবিত রাখেন, অর্থাৎ সারা রাত আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীতে জেগে থাকেন। এ রাত হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেরাজের রাত। এ রাত জেগে কাটালে অনেক বরকত হাসেল হয়। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত এ পবিত্র রাতকে শ্রেষ্ঠ মনে করে পরওয়ারদীগারের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে বিনিদ্রায় অতিবাহিত করা। এরপর বললেন, আল্লাহ্ তায়ালার দর্শন প্রাপ্ত এক ব্যক্তি সব সময়েই এ রাতে জাগ্রত থাকতেন যাতে এ রাতের ঐশ্বর্য লাভ করতে পারেন। শেষ পর্যন্ত শবে মিরাজের ঐশ্বর্য লাভের মনোষ্কাম তাঁর পূর্ণ হলো। অর্থাৎ যখন নেয়ামতের সময় এলো তিনি জেগেছিলেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন যে আসমান ও জমিনকে একটা পথ সংযুক্ত করেছে। পথটি অত্যন্ত প্রশস্ত। হেজাবে আযমত হতে তাহতে আছরা পর্যন্ত সমস্ত রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে এবং জগতের সমস্ত কিছুকেও উন্মুক্ত করে ধরা হয়েছে। এ সমস্ত সেই দীদার লাভকারী ব্যক্তির দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করছিলো এবং তিনি সে অলৌকিক দৃশ্য দেখা মাত্র দাঁড়িয়ে গেলেন। আরজ করলেন, ইয়া বারে এলাহি তোমার এ নেয়ামত আমি অবলোকন করে তৃপ্ত হলাম। এখন আমি আর চাইনা যে এ অলৌকিক বস্তু ও দৃশ্য দেখার পর পুনরায় দুনিয়ার দৃশ্য দেখি। বলার সাথে সাথে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর ইচ্ছা কবুল করলেন এবং তাঁকে তাঁর নিকট নিয়ে নিলেন। এরপর হুযুর ইরশাদ করলেন, যখন মানুষের কর্ম কামালিয়াত (পরিপূর্ণতা) লাভ করে তখন দুনিয়ায় তার থাকার জায়গা হয় না যার জন্য সে দুনিয়া ত্যাগ করে। এসব উপক্রিয়া বলার সময় হযরত খাজার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো এবং নিম্নোক্ত বায়ত্ আবৃত্তি করলেন।

چوں جان محبان زجهان برگیرند
انجا ملك الموت كجايابدجاے

উচ্চারণ ঃ চুঁ জানে মুহিব্বান যে জাহান বর গিরান্দ
আঁযা মালেকুল মওত কুজা ইয়াবদ জায়ে।

অর্থ ঃ প্রাণ যখন তার প্রেম করে, মাশুল লয় সে এ সুন্দর বিশ্ব হতে
সেথায় মৃত্যু দূতের স্থান কোথায়।

এরপর বললেন হে বন্ধুগণ, যখন ঐশী-প্রেমোন্মাদনায় উন্মত্ত-স্তম্ভিত ব্যক্তি ঐশী-অচৈতন্যলোকে বিরচণ করে তখন দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত বস্তুর প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাত করার সময় থাকে না। তারপর বললেন এক আরিফ আল্লাহ্ পাকের কালাম কুরআন শরীফ পাঠ করছিলেন সূরা নূহের–

مَالَكُمْ لَاتَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ـ

উচ্চারণ ঃ মা লাকুম লা তারজুনা লিল্লাহি ওয়া কারান।

এ আয়াতে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন এ আয়াতে বলা হয়েছে, যা তোমার নিকট পৌঁছেছে তা তুমি জ্ঞাত নও। এক ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালাকে জানেন অথচ সে তাঁকে ভয় করে না। কেননা দেখা যাচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ে খুব কম সংখ্যক হৃদয়ে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়া কাদ খালাকাকুম আতওয়া দান।

অর্থাৎ সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে এক বিশেষ অবস্থা হতে অন্য অবস্থাতে। সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে নাপাক পানি হতে। প্রথমে সেটা তোমাদের পিঠে শুক্রকীট রূপে ছিলো তারপর তা গর্ভাশয়ে জমাট রক্তপিন্ডে পরিণত হয়েছে। পরে রক্তপিন্ড হতে মাংসপিন্ডে এবং তারমধ্যে হাড়ের সংযোগ ঘটিয়েছি। সর্বশেষ চামড়ার আচ্ছাদন, শিরা উপশিরা ও রক্ত প্রবাহিত করে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছি।

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ـ

উচ্চারণ ঃ আলামতারা কায়ফা খালাকাল্লাহু সাবআ' সামাওয়াতে তিবকান।

অর্থ ঃ সে কি দেখেনা আল্লাহ্ তায়ালা তাকে কি ভাবে সৃষ্টি করেছেন সাত আসমানের নিচে।

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়া জায়ালাল কামারা ফিহিন্না নুরান।

অর্থ ঃ এবং চন্দ্রকে আকাশে দীপ্তিময় করা হয়েছে। অর্থাৎ চন্দ্রের মাঝে আলোর ব্যবস্থা করে রাতের অন্ধকারকে বিদূরতি করে আলোকিত করা হয়েছে।

وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়া জায়ালাশ্ শামছা সিরাজান।

অর্থ ঃ এবং সূর্যকে তোমাদের জন্য চেরাগ করে তৈরি করা হয়েছে যার আলোতে তোমরা কাজ কর্ম করো।

وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাহু আনবাতাকুম মিনাল আরদি নাবাতান।

অর্থ ঃ এবং আল্লাহ্ আয্ ও জাল্লে তোমাদের জন্য জমিন হতে উদ্গাত করেন উদ্ভিদ ও শস্য ইত্যাদি।

ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا ـ

উচ্চারণ ঃ ছুম্মা ইয়্যু'ইদুকুম ফিহা।

অর্থ ঃ আবার তোমাকে ফিরিয়ে নেয়া হয় এর মধ্য হতে।

وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইউখরিযুকুম ইখরাজান।

অর্থ ঃ এবং বের করা হবে তোমাদেরকে বের করার মতো করে। অর্থাৎ হাশরের দিন তোমাকে জমিন হতে হিসাব আদায়ের জন্য বের করা হবে।

ঐ সূফি সূরা নূহের এ পর্যন্ত পাঠ করেছিলেন এবং এর অর্থগুলো অতি গভীরভাবে অনুধাবন করছিলেন। যখন তিনি আয়াতের শেষ কথাটির তাৎপর্য চিন্তা করছিলেন তখন তিনি চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং একদিন একরাত অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রইলেন। সাধারণ জ্ঞান লাভের পর তিনি

ঐশী-প্রেমাকর্ষিত অচৈতন্যলোকে গমন করে বিচরণ করতে লাগলেন। কখনও কোন সময়ের জন্য আর তাকে মৃত্যুর পূর্বে ইহ জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হয়নি। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে তিনি আর বৈষয়িক জ্ঞানে ফিরে আসেন নি। ইহলোক ত্যাগকালীন সময়ে সে মাথা সেজদায় রেখে প্রাণ প্রাণের মালিকের নিকট অর্পণ করেছিলেন। খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের এ ঘটনা বর্ণনা করতে করতে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্নায় মজলিসেও কান্নার রোল পড়ে গেলো। প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর পূর্বোক্ত বয়ত্টি পুনরায় আবৃত্তি করলেন।

چون جان محبان زجهان برگیرند

آنجا ملك الموت كجايابدجائے

এরপর বললেন হে দরবেশগণ। যাঁকে তিনি নিজের প্রেমিক ও পাগল বানান, তাঁর শরীরেও সহ্যক্ষমতা দান করে তৈরি করেন। সে দুনিয়া, আসমান ও ঐশীজগতের সমস্ত অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য ও অলৌকিক বস্তু দৃশ্য ও অদৃশ্য সবই দেখতে পান। তাতে স্রষ্টার প্রতি তাঁর মুহাব্বাত আরো বৃদ্ধি পায় এবং প্রেমের স্বরূপ সে লাভ করতে সমর্থ হয়। পরবর্তী সময়ে হাজার কষ্টেও সে আর পশ্চাৎপদ হয় না। তখন সে ঐশীপ্রেমালোকের জগতে ভ্রমণ করতে থাকে। এ ঘটনা বলতে বলতে হযরত খাজাও ঐশী-প্রেমাচৈতন্যলোকে গমন করলেন। এ অবস্থায় মজলিস শেষ হলো।

—আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

তৃতীয় মজলিস

বৃহস্পতিবার, ২রা শাবান, ৬৮৯ হিঃ। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ আলাইহিস্ সালাম সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। এ সময় মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, মাওলানা বুরহানুদ্দিন গরীব, মাওলানা শামস্উদ্দিন ইহ্ইয়া এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সূফিগণ। হযরত ইরশাদ করলেন, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে অনেক নেয়ামত দান করেছেন যা দুনিয়ার খুব কম লোককে দান করা হয়। যেমন–প্রথমতঃ আমাকে হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত করে পয়দা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ আমি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামের মিল্লাতের মধ্যে স্থান পেয়েছি। তৃতীয়তঃ আমি ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা কুফী রহমতুল্লাহি আলাইহির মাযহাবে স্থান পেয়েছি। চতুর্থতঃ আমাকে মুসলমান রূপে পাঠানো হয়েছে এবং পবিত্র কলেমা–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

সিদ্দিক দিলে অর্থাৎ পবিত্র অন্তঃকরণে পাঠকারীদের মধ্যে গণ্য হয়েছি।

হযরত ইব্রাহিমু খলিলুল্লাহ আলাইহিস্ সালামকে যখন মূর্তি প্রস্তুতকারী আযরের ঘরে আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়ায় পাঠালেন তখন নমরুদ কর্তৃক নবজাতক পুত্র গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিলো তাই তার ভয়ে আযর তার নবজাতক সন্তানকে এক গুহায় রেখে এলো। পরম করুণাময় বিশ্বপালক বিধাতা তাঁর অসীম কুদরত দ্বারা তাঁকে সেই অন্ধগহ্বরে লালন পালন করতে থাকে। আল্লাহ্ যাল্লে শানহুর পবিত্র ও সীমাহীন কুদরতের মাধ্যমে নবজাতক হযরত ইব্রাহিমু খলিলুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম-এর পবিত্র আঙ্গুলের মধ্যে দুধের প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিলো এবং সেই আঙ্গুল চুষেই তিনি তাঁর আহারের কাজ সমাধা করতেন। এ অবস্থাতেই তিনি তাঁর জীবনের বাল্যকালে পৌঁছেন। অর্থাৎ এ অন্ধকার গুহাই ছিলো তাঁর আবাস স্থল এবং আঙ্গুল হতে প্রবাহিত দুগ্ধই ছিলো তাঁর একমাত্র খাদ্য। একদিন এক গভগোলের রাতে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম গুহা হতে বাইরে বেরুলেন। প্রথমে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখতে পেলেন উজ্জ্বল চন্দ্রকে। তিনি ভাবলেন যার কিরণে এ ধরাতল আলোকিত তিনিই হয়তো এ

ধরনীর স্রষ্টা হবেন। কিন্তু চন্দ্র অস্তমিত হওয়ার পর তাঁর ধারণা বদলে গেলে এবং তিনি বললেন, না, যে নিজেই ক্ষণস্থায়ী সে কখনও স্রষ্টা হতে পারে না। রাতের অন্ধকারকে দূর করে যখন সূর্য পূর্ব গগনে উকি দিয়ে প্রকাশ হতে লাগলো তখন তার তেজদীপ্তভাব দেখে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম ভাবলেন এই হয়তো প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা হতে পারে। কিন্তু সন্ধ্যায় সেও যখন পশ্চিম আকাশে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো তখন ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম বললেন, না, যে নিজেই স্থায়ী নয় সে কখনও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। এরপর তিনি চন্দ্র ও সূর্যের স্রষ্টাকে চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে গুহা ত্যাগ করে প্রকৃত স্রষ্টার সন্ধানে স্বীয় পিতা আযরের নিকট গমন করলেন। আযর ছিলো বুত-পোরস্ত অর্থাৎ মূর্তিপূজারী এবং সে নিজেই ছিলো আবার সেই মূর্তি প্রস্তুতকারক। অতএব সেখানেও যে তিনি তাঁর সত্য ও প্রকৃত স্রষ্টার ব্যাপারে কোন সাহায্য পান নি সে কথা উল্লেখের প্রয়োজনই রাখে না।

হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম-এর পিতা আযর ছিলো সে সময়ের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মূর্তি প্রস্তুতকারক। তার মতো অতো সুন্দর মূর্তি ঐ সময়ে আর কেউ বানাতে পারতো না। আযর মূর্তি বানিয়ে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামকে দিতো বাজারে বিক্রি করার জন্য। তিনি মূর্তির গলায় রশি লাগিয়ে বাজারে নিয়ে যেতেন এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থ তাঁর পিতাকে দিতেন।

নমরুদের নিকট সংবাদ পৌঁছলো মূর্তি প্রস্তুতকারক আযরের পুত্র ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম আমাদের মূর্তিগুলোকে অসম্মান করে এবং গলায় রশি বেঁধে বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যায়। সে কখনও কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন বা ভক্তি শ্রদ্ধা কিছুই করে না। এর কারণে আমাদের দেশের ধর্মে গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে কেননা তাঁর নাম শুনলেই আমাদের গায়ে যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। অতএব একে জীবিত রাখা ঠিক নয়। 'কাসাসে' বর্ণিত আছে একবার ঈদের দিন আযর নমরুদের মূর্তি দিয়ে মন্ডব সজ্জিত করছিলো এবং এদিকে নমরুদ মূর্তি দর্শনে আগমন করবে বলে কথা ছিলো। আযরের কাজ শেষ হয়েছিলো। কিন্তু নমরুদের আগমনের তখনও দেরী ছিলো তাই আযর নিজের বাড়ির কিছু কাজ সারার জন্য ছেলের প্রতি মন্ডপ ঘরের দায়িত্ব দিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়ালো। যাওয়ার সময় ছেলেকে বলে গেলো, ইব্রাহিম তুমি বাদশাহ্ আসার পূর্ব পর্যন্ত এখানে বসে থাকবে এবং খুব ভালোভাবে এর রক্ষণাবেক্ষণ করবে অবশ্য আমিও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে আসবো। ছেলেকে উপদেশ দিয়ে সে চলে গেলো। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম মূর্তি ঘরের দরজায় বসা ছিলেন কিন্তু যাঁর

মাঝে রয়েছে নবুয়তের আশীষ তাঁর দ্বারা কি আর মূর্তি পাহারা চলে? হঠাৎ নবুয়তের মর্যাদার জোশ তাকে উত্তপ্ত করে তুললো। তিনি একটা কুঠার হাতে নিয়ে মূর্তিঘরে প্রবেশ করলেন। তাদের সম্মুখে নানা প্রকার খাদ্য সজ্জিত ছিলো। তিনি মূর্তিদেরকে বলতে লাগলেন, এমন গরম গরম খাবার কেন খাচ্ছ না? তোমরা খেতে কি লজ্জা বোধ করছো? যখন মূর্তিরা তাঁর প্রশ্নের কোন উত্তরই দিলো না তখন তিনি কুঠার দ্বারা প্রত্যেকটিকে আঘাত করতে লাগলেন। এভাবে আঘাত করায় প্রত্যেকটি মূর্তিই নষ্ট হয়ে গেলো। মূর্তিগুলোর মাঝে একটা ছিলো বেশ বড়। সেটাকে কুঠার দ্বারা কয়েক ঘা লাগিয়ে দিয়ে তিনি তার কাঁধে কুঠারটি রেখে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে বসে রইলেন, যেন তিনি তাঁর দায়িত্ব পূর্ণরূপেই পালন করেছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর পিতা আযর ফিরে এলো। মূর্তিঘরে প্রবেশ করেতেই তার হৃদয় কেঁপে উঠলো। একি এতো সুন্দর মূর্তিগুলোর উপর দিয়ে এমন ধ্বংসযজ্ঞ কে চালালো? মন্ডপ ঘর হতে বেরিয়ে এসে সে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞেস করলো, হে ইব্রাহিম, মূর্তিগুলোকে এভাবে কে নষ্ট করেছে? উত্তরে তিনি বললেন, ঘরের ভিতরের কোন খবর আমি বলতে পারবো না, তবে বাইরে থেকে ভিতরের কোলাহল শুনে তাকিয়ে দেখলাম যে ঐ বড় মূর্তিটা কুঠার দ্বারা ছোট মূর্তিগুলোকে আগাত করে নষ্ট করে দিচ্ছে ; কিছুক্ষণ পর দেখলাম সে আবার তার জায়গায় যেয়ে বসে আছে। তার পিতা আযর কথা শোনে বললো, ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম তুমি ভালো করেই জানো, তারাই চলাফেরা করতে পারে যাদের প্রাণ আছে। এদের প্রাণ নেই সুতরাং এরা কি করে চলাফেরা করবে? পিতার নিকট হতে এ কথা শ্রবণ করার সাথে সাথে তিনি বলে উঠলৈন, তাহলে তো এটা নির্ঘাত একটা অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। যাদের দ্বারা কোন কাজ হবে না, যারা হাঁটতে জানে না, খেতে পারে না, কথা বলতে পারেনা, তারা মানুষের উপাকারতো দূরে থাকুক নিজেদের কি মঙ্গল সাধন করতে পারবে? এগুলো শুধু মাটি ছাড়া আর কি? এবং মাটি আপনাদের কি উপকার করতে পারবে বলুন? এমন জিনিসকে এভাবে যত্ন করে সজ্জিত করার কি কারণ থাকতে পারে? আযর এসব কথা শোনার পর স্তব্ধ হয়ে গেলো এবং বুঝতে পারলো যে এ ছেলে নবী হবে, যার কথা সহিফাতে লেখা রয়েছে।

হযরত খাজা যিরকরুল্লাহ্ বিল খায়ের এরপর বললেন, ঐ ঘটনার পর হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালামকে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম-এর নিকট প্রেরণ করলেন। হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম তাঁর নিকট পৌছে বললেন, আপনার প্রতি নির্দেশ হয়েছে আপনি নমরুদের নিকট যান এবং

তাকে বলেন এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনতে। এ ঐশী হুকুম পেয়ে তিনি নমরুদের নিকট গেলেন এবং নিজেকে নবী বলে প্রকাশ করলেন। তাঁর আলোকিত মুখ মণ্ডল দেখে বেদ্বীনদের গায়ে কম্পন আরম্ভ হয়ে গেলো। তারা নমরুদকে বলতে লাগলো, গোলমাল শুরু হয়ে গেলো। হুজুর আমাদের মান, সম্মান ও ঐশ্বর্য সবই এ ব্যক্তির কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে।

হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম-এর দল যখন শক্ত হলো তখন প্রকাশ্যভাবে তাঁর নবুয়তের বাণী প্রচার হতে লাগলো। এ অবস্থায় ধর্মত্যাগী নমরুদ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামকে ডেকে নিয়ে বললো, আপনি রেছালতের কোন বড় রকমের মুজেজা (আলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা কোন অসম্ভব কার্য সম্পাদন করা) প্রদর্শন করতে পারলে আমি আপনার সত্য ধর্ম গ্রহণ করবো। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম বললেন, আপনি যে কোন ধরনের মুজেজা দেখতে চান তাই দেখানো হবে। এ উত্তর শোনার পর কাফেরগণ নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে বললো আপনি মৃতকে জীবিত করুন, যদি মৃত জীবিত হয় তাহলে আমরা আপনাকে নবী বলে স্বীকার করবো এবং আল্লাহ তায়ালার দ্বীন গ্রহণ করবো। তিনি তাদের শর্ত মেনে নিয়ে বললেন, কোন মৃত প্রাণী আনা হোক। তারা চারটে মোরগ মেরে এবং তাদের মাংস এক সঙ্গে কুফ্‌তা বানিয়ে এভাবে নিয়ে এলো যেন একটিরই মাংস, চারটের কোন প্রভেদ নেই। তারা সেই কুফতা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম-এর সম্মুখে উপস্থিত করে বললো, এ চারটে মোরগকে জিন্দা (জীবন দান) করুন। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম দোয়া করলেন, আল্লাহ পাকের নির্দেশ এলো, "চিন্তার কোন কারণ নেই, আমি কাফেরদের ইচ্ছা তোমর মাধমে পূর্ণ করে দিচ্ছি।" এ নির্দেশ পাওয়া মাত্র তিনি কাফেরদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের ইচ্ছা মতো এ মিশ্রিত কুফতাগলোকে চারভাগে বিভক্ত করে যে কোন স্থানে রাখতে পার। কাফেরগণ একথা শুনামাত্র মাংসের কুফতা চারভাগে ভাগ করে চারটে বিভিন্ন পাহাড়ে রেখে এলো। এরপর হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম মোরগ চারটিকে ডাকলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মোরগ চারটি জাগরিত হয়ে তাঁর নিকট আগমন করলো। কাফেরগণ এ অলৌকিক ক্ষমতা দেখে হতভম্ব ও বিস্মিত হয়ে পড়লো এবং তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ছিলো তারা ঈমান আনলো। কিন্তু বিশ্বাস ঘাতক নমরুদ বেদ্বীনিতে আচ্ছাদিত হয়ে এবং পাপের ভারে অন্ধ হয়ে এ মোজেজাকে যাদু বলে আখ্যায়িত করলো। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম নমরুদকে অনেক ধৈর্য সহকারে বুঝাবার বহু চেষ্টা করলেন কিন্তু নমরুদ তাতে বিরক্ত হয়ে পড়লো।

ক্রমে ক্রমে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামের উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়াতে নমরুদের বিপদ ঘটলো। সে তার মন্ত্রিবর্গকে একত্রিত করে পরামর্শ করতে লাগলো যে, এমন কিছু একটা উপায় বের করতে হবে যাতে তাঁকে শেষ করে দেয়া যায়। অবশেষে তারা পরামর্শ করে স্থির করলো যে একটা প্রকান্ড ঘর তৈরী করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে এবং সেই আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে যদি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামকে নিক্ষেপ করা যায় তাহলে সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটবে। তখন তার অস্তিত্বের ভাস্মাবশেষও আর পাওয়া যাবে না। বর্ণিত আছে যে, নমরুদ তার পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকান্ড ঘর তৈরী করে তাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলো এবং লক্ষ লক্ষ মন লাকড়ী তার মধ্যে নিক্ষেপ করে তাকে এতো তেজোদীপ্ত করা হলো যে তার উত্তাপে চতুর্দিকে ১২০ মাইল ব্যাসার্ধ পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে রইলো। বিহঙ্গকুল আকাশে উড়তে পারছিলো না উড়লেও সাথে সাথে দগ্ধিত হয়ে মৃত্যু বরণ করতে লাগলো। পরিশেষে সে আগুন যখন পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহণ করলো তখন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামকে তা দেখার জন্য দর্শক-গ্যালারীতে ডেকে আনা হলো। তিনি সেখানে পৌঁছামাত্র তাঁর সাথে ঝগড়ার বাহানায় তিরস্কার করে তাকে ধাক্কা দিয়ে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হলো। সমস্ত আসমান ও জমিনের সমস্ত ফেরেস্তা এ প্রেমের খেলা উপভোগ করার জন্য সে স্থানে জড়ো হয়েছিলো। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ হওয়ামাত্র ফেরেস্তাগণ বলতে লাগলো, এইতো প্রকৃত প্রেমের পথে প্রকৃত প্রেমিকের পথযাত্রা। ইত্যবসরে হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামের নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, 'আপনি যদি এ বিপদে সাহায্য চান তো বলূন আমি আমার এ বিশাল পাখা দ্বারা আগুনকে নির্বাপিত করে ঠান্ডা করে দিই। তিনি উত্তরে বললেন, তোমার নিকট হতে আমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই; যাঁর ইচ্ছা ব্যতিত কোন কাজ সংঘটিত হয় না এবং যার ইচ্ছায় আমি এ অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছি প্রয়োজন হলে তিনিই আমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এ কথা শ্রবণ করা মাত্র হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম সেজদাবনত হয়ে বললো, ইয়া বারে এলাহি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামের মাঝে যে বিশ্বস্ততা, সততা ও প্রেম দেখতে পেলাম তা এ পর্যন্ত অন্য কারও মাঝে দেখতে পাই নি। এ দিকে হযরত জিব্রীল হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামের কথোপকথন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন শ্রবণ করার সাথে সাথে বিশাল অগ্নিকুন্ডের প্রতি হুকুম করলেন–

يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ -

হে অগ্নি শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও ইব্রাহিমের উপর। আল্লাহ্ পাকের এ হুকুম হওয়া মাত্র অগ্নিকুন্ডের মধ্যস্থল শীতল ও শান্তির বাগান হয়ে গেলো।

শ্লোক

ارزوئے باغ وبستاں تازہ شد
صبح را ازبو گل جان تازہ شد

বাংলায় উচ্চারণ ঃ আরজুয়ে বাগ ও বুস্তাঁন তাজাহ শুদ
সুবেহ রা আয বুয়ে গুল জাঁ তাজা শুদ

অর্থ ঃ কানন ও কুঞ্জবন হয়েছে সজীব তোমারই ইচ্ছায়
প্রাতে পুষ্প সুবাসে হয়েছে সজীব জীবন মোর তোমারই ইচ্ছায়।

আসল কথা হলো স্রষ্টার ইচ্ছায় সে অগ্নিকুন্ডে একটা পুষ্পকানন তৈরী হয়েছিলো। আর সেই বাগানে তৈরী হয়েছিলো একটি সিংহাসন যার মধ্যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় নমরুদ তনয়া তার মহলের উপরে উঠে এ তামাশা অবলোকন করছিলো। আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিলো তার প্রতি করুণা করা তাই তার দৃষ্টির সম্মুখ হতে প্রকাশ্য পর্দা উন্মোচন করে প্রকৃত ঘটনা অবলোকন করালেন তাকে। সে দেখতে পেলো আগুনের মধ্যস্থলে একটি পুষ্পকানন রচিত হয়েছে এবং তার মধ্যে এক সিংহাসন, আর সে সিহংহাসনে উপবিষ্ট হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম। এ দৃশ্য দেখার সাথে সাথে সে ঈমান আনলো এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত অন্তরে মুসলমান হয়ে গেলো।

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত খা'জা যিকরুল্লাহ বিল খায়েরের (খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়া রহতুল্লাহি আলাইহি) চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি সেই অশ্রুসজল নয়নে বলতে লাগলেন, যদি তাঁকে (হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামকে) নিরাপদ রাখার ইচ্ছা না করতেন তাহলে অবশ্যই তাঁর জন্য ঐ অগ্নিকুন্ড ক্ষতিকারক হতো এবং তিনি ইন্তিকাল করতেন। এরপর বললেন, অগ্নিকুন্ডের অগ্নি নির্বাপিত হওয়ার পর হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় অক্ষত শরীরে ভষ্মস্তুপের মধ্য হতে বেরিয়ে এলেন। এ দৃশ্যে সব কাফেরগণ অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়লেন। আর নমরুদ তাকে ডেকে বললো ইব্রাহিম তুমি যাদুবদ্যিায় সত্যিই খুব উন্নতি লাভ করেছো, না হলে এভাবে জান বাঁচাতে পারতে না।

পরবর্তী সময়ে যখন নমরুদকে আর কোন অবস্থাতেই ঈমান আনানো গেলো না এবং গোমরাহীর চরম অবস্থায় উপনীত হলো তখন হক তায়ালা (আল্লাহ তায়ালা) তাকে ও তার দলকে বালা-মুসিবতে নিক্ষিপ্ত করলো। খা'জা জিকরুল্লাহ বিল খায়ের বরলেন, আমি খা'জা শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট শুনেছি, আল্লাহ্ তায়ালা যেদিন নমরুদ ও নমরুদের সৈন্য সামান্তকে নিঃশেষ করার জন্য মশককূলকে সৈন্য হিসেবে নমরুদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন তখন এক দল মশা নমরুদের সৈন্য ও লোকদেরকে মারার জন্য বিভক্ত হয়ে পড়লো। তারা মেঘের মধ্য হতে বেরিয়ে এসে ঐ সব ব্যক্তিদেরকে দংশন করতে লাগলো যারা নমরুদের সমর্থক, সাহায্যকারী ও কাফের ছিলো। মশাগুলোর হুলে ছিলো বিষ মিশ্রিত তাই তারা যাকেই দংশন করছিলো তারাই সাথে সাথে মারা যাচ্ছিলো। এরপর খাজা জিকরুল্লাহ বিল খায়ের বললেন, হে দরবেশগণ মশক দ্বারা নমরুদকে ধ্বংস করার প্রধান কারণ ছিলো যে অতি সামান্য ও নগন্য প্রাণী দ্বারাও আল্লাহ্ তায়ালা ইচ্ছা করলে বিরাট ও শক্তিশালী জনগোষ্ঠীকেও শেষ করে দেয়া যায় তার নিদর্শন তুলে ধরা এবং মানুষ তার ইচ্ছার নিকট কত অসহায় তার সামান্য প্রমাণ রাখা। আল্লাহ্ তায়ালার কাহ্হার (ক্রোধ) হতে যদি সামান্য মাত্র একটি ফোটা দুনিয়ায় পতিত হতো তাহলে দুনিয়া ও তার সমস্ত বস্তু নিমেশে ধ্বংস হয়ে যেতো। উদয় হতে অস্ত পর্যন্ত সকল কিছু উলটপালট হয়ে যেতো।

এরপর ইরশাদ করলেন যে, আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, যে মশাটি নমরুদকে মেরেছিলো সে ছিলো ল্যাংড়া এবং একটা ডানা ভাঙ্গা ছিলো তার। যখন মশককুল সৈন্যবেশে নমরুদের কওমের উপর মরণাঘাত হানতে চললো, তখন সে ল্যাংড়া মশাটি আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে আবেদন জানালো যে, হে আল্লাহ আমি বৃদ্ধ, আমার একটা পা নেই একটা ডানাও ভাঙ্গা আমার দ্বারা কি আর এমন কোন কাজ সাধিত হবে? আমার প্রতি খেয়াল রেখে আমায় করুণা ও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখুন। এর প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ্পাকের হুকুম হলো, হে মশা চিন্তা করিস না আমি তোর দোয়া কবুল করে নিয়ে তোর মাঝে এমন শক্তি সঞ্চারিত করলাম যে তুই ঐ বিশ্বাসঘাতক নমরুদকে হত্যা করবি।

এরপর খাজা জিকরুল্লাহ্ বিল খায়ের বললেন, হে দরবেশগণ, কোন জিনিস দ্বারা প্রবঞ্চিত করা ভালো নয় যা অন্যকে অশান্তি দান করে এবং নিজেকেও মুক্তি দেয় না। নমরুদ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামকে যেরূপ দুঃখ দিয়েছে নিজেও তার প্রতিফল পূর্ণরূপেই ভোগ করেছে। এটা অত্যন্ত সত্য কথা যে, যে যেমন ফসল বপণ করবে সে তেমনি ফসলই লাভ করবে। যেমন যদি কেউ গম বপণ করে সে গমই পাবে। অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল। এরপর ইরশাদ করলেন যে, নমরুদ ধ্বংস হওয়ার পর ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম এর উপর হুকুম হলো কাবা ঘর তৈরি করার। তিনি কাবা ঘরের দালানটি তৈরি করলেন। তারপর তাঁর প্রতি হুকুম হলো তোমার নিকট যে জিনিস সবচেয়ে প্রিয় সেটাকে তুমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কুরবান (উৎসর্গ) করো। একই দিনে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে এক ব্যক্তি তাঁকে বলছেন, হে ইব্রাহিম (আলাইহিস্ সালাম) প্রিয়তম জিনিসের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে তোমার পুত্র ইসমাইল। তাকেই তুমি আল্লাহ্পাকের রাস্তায় কুরবান করো। যখন তিনি স্বপ্ন হতে জাগলেন তখন নতুন করে অযু করলেন। তারপর হযরত ইসমাইলের উদ্দেশ্যে বের হয়ে তাঁকে নিয়ে কাবা ঘরে গেলেন। তিনি পুত্রকে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা জানালেন। পুত্র পিতার পূণ্য কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে সম্মত হলেন এবং হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম তাঁকে জবেহ্ করার জন্য উদ্দত হলেন। এমতাবস্থায় হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম বেহেশ্ত হতে দুম্বা নিয়ে এসে আরজ করলেন যে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইসমাইল আলাইহিস্ সালামের কুরবানী কবুল করেছেন। বন্ধুত্বের দাবীতে আপনাকে সিদ্দিক অর্থাৎ সঠিক পাওয়া গেছে তাঁর পরিবর্তে বেহেস্তী দুম্বাটি কুরবানী হয়ে গেলো।

হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামের দ্বিতীয় পুত্র হযরত ইসহাক আলাইহিস্ সালাম যখন ভুমিষ্ট হলো তখন হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্ প্রদত্ত সালাম ও সুসংবাদ দান করলেন যে, আপনার এ ছেলে নবী হবে এবং এর বংশে হবে সত্তর হাজার নবী। আরও বললেন যে তিনি আপনাকে সাহেবে মিল্লাত নির্বাচন করেছেন। অর্থাৎ আপনার নামেই হবে, মিল্লাত বা ধর্ম। পবিত্র কোরনের ভাষায়- مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْم - মিল্লাতা আবিকুম ইব্রাহিমা। যখন আল্লাহ্র এ বাণী তিনি শ্রবণ করলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে যেয়ে নতুন অজু করে দু' রাকাত শুকরানা নামাজ আদায় করলেন।

হযরত ইসমাইল আলাইহিস্ সালাম ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বড় কিন্তু মাতা ভিন্ন। হযরত ইসহাক আলাইহিস্ সালামের মাতার নাম হযরত সারা আর ইসমাইল আলাইহিস্ সালাম-এর মাতার নাম হযরত বিবি হাজেরা। ছোট পুত্রের সুসংবাদে তিনি প্রফুল্ল হয়েছেন ঠিকই কিন্তু বড়টির সম্বন্ধে কোন ওহী না আসায় একটু বিষণ্ন ছিলেন। এমন সময় হযরত জিব্রীল আমিন অবতরণ করে বললেন, ইয়া ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম আপনার বড় ছেলে নিজে পয়গম্বর হবে কিন্তু তার বংশে কোন নবী হবে না। এ বাণী শ্রবণ করে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম ব্যথিত হলেন। কারণ তিনি ভাবলেন একজনের বংশে এতো অধিক পয়গম্বর আর একজনের ভাগ্যে একেবারেই শূন্যতা। তাঁর একথা চিন্তার সাথে সাথে আল্লাহ্র বাণী নিয়ে হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ হচ্ছে আপনি এভাবে মন খারাপ করছেন কেন? তিনি বলেছেন, তাঁর বংশে কোন সাধারণ নবীর আবির্ভাব ঘটবে না তা ঠিক কিন্তু এমন একজন নবী ও রাসূলকে আল্লাহ্ তাঁর বংশে পাঠাবেন যার কারণে আল্লাহ্ আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল আলাইহিস্ সালাম। যখন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম এ শুভ সংবাদ শ্রবণ করলেন তখন এক হাজার রাকাত কৃতজ্ঞতার নামাজ আদায় করলেন।

এরপর খাজা যিকরুল্লাহ্ বিল খায়ের এরশাদ করলেন, হে দরবেশগণ দুনিয়ায় কোন ব্যক্তিই ঐশ্বর্য হতে বঞ্চিত নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ঐশ্বর্য দান করা হয়েছে সেটা দ্বীনের হোক অথবা দুনিয়ার। অবশ্য তারাই অতি সৌভাগ্যবান যাঁদেরকে উভয় প্রকার ঐশ্বর্য দান করা হয়েছে। এরপর বললেন, যখন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামকে "খলিলুল্লাহ" (আল্লাহ্র বন্ধু) উপাধি দান করা হলো, তখন পরীক্ষার জন্য হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালামকে পাঠানো হলো। তিনি এসে কাবা ঘরের দ্বিতলের অলিন্দে দাঁড়িয়ে একবার 'আল্লাহ্' শব্দটি উচ্চারণ করলেন। সে সময় হযরত ইব্রাহিম আল্লাইহিস্ সালাম কাবা ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'আল্লাহ্' নাম শ্রবণ করার সাথে সাথে চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং জ্ঞান হারালেন। একটু পরে যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন চারিদিকে দৃষ্টি মেলে অনুসন্ধান করতে লাগলেন, এ আল্লাহ্ শব্দটি কে উচ্চারণ করলো? কিন্তু কাউকে তিনি সেখানে দেখতে পেলেন না। অবশেষে তাঁর দৃষ্টি যখন কাবা ঘরের দ্বিতলের অলিন্দে পতিত হলো তখন তিনি দেখলেন যে

সেখানে একটি লোক দাঁড়িয়ে জেকেরে নিরত হয়েছে। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম তাঁর নিকট যেয়ে বললেন, হে খোদার বন্ধু তুমি আর একবার ঐ নাম উচ্চারণ করো। হযরত জিব্রীল আল্লাইহিস্ সালাম বললেন, আমি শুকরানা (বিনিময়) ব্যতীত ঐ নাম লই না। তখন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম বললেন, আমি আমার সমস্ত মাল ঐ নামের জন্য উৎসর্গ করছি। অর্থাৎ তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। তিনি এ কথার উপর আর একবার সেই "আল্লাহ্" নাম নিলেন। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম ঐ নাম শ্রবণ করার সাথে সাথে পুনরায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন এবং যখন জ্ঞান ফিরলো তখন হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালামকে আর একবার ঐ নাম নেয়ার জন্য অনুনয় করলেন। হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম বললেন, এবার বিনিময়ে কি দিবে? হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম বললেন, এবার আমি আমাকে দিয়ে দিব ঐ নামের জন্য। হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম এ কথা শ্রবণ করার পর সে স্থান ত্যাগ করে স্বীয় স্থানে আগমন করে মাথা সেজদাবনত করে বললেন, ইয়া বারে ইলাহি ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম নিঃসন্দেহে নিষ্ঠাবান, বিশ্বাসী এবং বন্ধু। আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক অধিক পেয়েছি তার মাঝে।

পরবর্তী আলোচনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্সালাম এর মোহরে নবুয়ত (নবী পরিচিতির সীলমোহর) সম্বন্ধে আরম্ভ হলো। তিনি ইরশাদ করলেন যে মোহরে নবুয়ত অবলোকনকারী দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে না। কেননা নবুয়তের মোহর বা সীল দর্শন করলে দোযখের আগুন হারাম হয়ে যায়। বর্ণিত আছে যে আবু জেহাল কৌশল করে নবুয়তের মোহর দর্শন করতে চেয়েছিলো। অর্থাৎ হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্সালামকে বাইরে থেকে কেউ ডাকলে তিনি নগ্ন শরীরে বেরুতে চাইলেন, কিন্তু আল্লাহ্ পাকের হুকুম হলো জামা গায়ে দিয়ে বেরোয়। আগন্তুক যেন আপনার মোহরে নবুয়ত দেখতে না পায়, কেননা সে দোযখে যাবে। যদি সে কোন প্রকার মোহরে নবুয়ত দেখে ফেলে তাহলে তার জন্য দোযখ হারাম হয়ে যাবে। এরপর বললেন যে, হুজুর আলাইহিস্ সালামের বেছাল (ইন্তেকাল) মোবারকের সাথে সাথে তাঁর দেহ মোবারক হতে মোহরে নবুয়ত তুলে নিয়েছিলেন আল্লাহ্ তায়ালা। তাঁকে গোসলদানকারী ব্যক্তিগণ হতে বর্ণিত আছে যে তাঁরা গোসলের সময় হুজুর

করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহে মোহরে নবুয়ত দেখতে পাননি। কারণ তিনি যখন দেহ ত্যাগ করেছেন তখন মোহরে নবুয়তও তাঁর দেহ ত্যাগ করেছে। বেছাল শরীফের পর হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম মোহরে নবুয়ত দ্বারা নবুয়ত ও রেছালাতের দরজায় সীল করে দিয়েছেন। এরপর বললেন হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম হাজার হাজার ফেরেস্তা সমভিব্যাহারে কাবা ঘরের অলিন্দে দাঁড়িয়ে উম্মতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালামের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও শান্তি কামনা করেন। হুযুর যখন এ উপক্রিয়া বয়ান করছিলেন তখন আযান হয়ে গেলো। হযরত পবিত্র নামাযে নিমগ্ন হলেন। মজলিস বরখাস্ত হলো।

–আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

চতুর্থ মজলিস

৯ই শাবান, বৃহস্পতিবার, ৬৮৯ হিজরী। কদমবুসির সৌভাগ্যে ভাগ্যবান হলাম। আলোচনা চলছিলো ইদ্রিস আলাইহিস্ সালাম ও হযরত ইসহাক আলাইহিস্ সালাম সম্বন্ধে। মাওলানা শামসউদ্দিন এহ্ইয়া, মাওলানা বোরহানুদ্দিন গরীব এবং মাওলানা ফখরুদ্দীন যারাদি ও অন্যান্য গন্যমান্য সূফি দরবেশ খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এরশাদ করলেন যে সুমহান ও একমাত্র পূজ্য আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইদ্রিস আলাইহিস্ সালামকে এতো অধিক জ্ঞান দান করেছিলেন যা অন্য কোন নবীকে দেননি। এরপর বললেন, হযরত ইদ্রিস আলাইহিস্ সালাম ভবিষ্যৎ জ্ঞানের (জ্যোতিষ বিদ্যা) পরিপূর্ণতায় পরিপূর্ণ ছিলেন। সে সময়ে সমকালীন সমস্ত জ্ঞানীগুনী, বিজ্ঞ, অজ্ঞ, শিক্ষক, ছাত্র সমস্ত ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য হযরত ইদ্রিস আলাইহিস্ সালামের নিকট গমন করতো। আমি এক বর্ণনায় দেখেছি যে জ্যোতিষ বিদ্যার প্রারম্ভ হতে পরিপূর্ণতার মূলে রয়েছে হযরত ইদ্রিস আলাইহিস্ সালাম। 'কাসাস' এর কিতাবে বর্ণিত আছে যে আল্লাহ তায়ালা চারজন পয়গম্বরকে চিরঞ্জীব করেছেন। তারা হচ্ছেন—

১। হযরত ইদ্রিস আলাইহিস্ সালাম, তিনি বেহেস্তে অবস্থান করছেন।

২। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম, তাঁকে জীবিত অবস্থায় তুলে নিয়ে চতুর্থ আসমানে রাখা হয়েছে। তিনি তথায় অবস্থান করছেন।

৩। হযরত খিজির আলাইহিস্ সালাম, তাঁকে চিরঞ্জীব অবস্থায় জল ও বনভূমিতে বিশেষ দায়িত্বে রেখেছেন।

৪। হযরত ইলিয়াস আলাইহিস্ সালাম, তাঁকে চিরজীবন দান করে মৃত্তিকার উপরে পথহারা পথিকদের পথ দেখিয়ে দেবার কাজে নিয়োজিত রেখেছেন পরম করুণাময় রাব্বুল আলামিন।

এ চারজন পয়গম্বরকে "উলুল আযম" বলা হয়। এদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা চিরজীবন দান করেছেন। এ চারজন সৃষ্টির জীবিতকাল পর্যন্ত জীবিত থাকবেন এবং সমস্ত সৃষ্টি বিলীনের প্রাক্কালে দেহত্যাগ করবেন। যখন ইদ্রিস আলাইহিস্

সালামকে বেহেস্তে নিয়ে যাওয়া হলো তখন তাঁকে বলা হলো আপনি এখানেই অবস্থান করুন এবং আল্লাহ্ তায়ালার বন্দেগীতে নিয়োজিত থাকুন। তারপর হতে তিনি বেহেস্তে বসবাস করছেন। একদিন তাঁকে বেহেস্তের সমস্ত প্রাসাদ দেখানো হলো। তিনি প্রত্যেকটি প্রাসাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছিলেন, এটা কার জন্য, ওটা কার জন্য ইত্যাদি। আল্লাহ্ তায়ালার তরফ হতে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। ঘুরতে ঘুরতে যখন তিনি হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালাম এর প্রাসাদের নিকট পৌঁছলেন তখন দেখলেন যে বিরাট ঐশ্বর্যমন্ডিত এক প্রাসাদ। এর চারদিকে আরও চারটে মনোরম সুদৃশ্য অট্টালিকা। সৌন্দর্যের দিক দিয়ে সমস্ত বেহেস্তের অট্টালিকার তুলনায় এগুলো অতুলনীয়। তুলনামূলকভাবে বলা চলে অন্যান্যগুলোর চেয়ে এগুলো ছিলো হাজর গুণ অধিক মনোরম ও সুশোভিত। এমন নয়নাভিরাম প্রাসাদ দেখে হযরত ইদ্রিস আলাইহিস্ সালাম জিজ্ঞেস করলেন এ অদ্ভুত ও অতুলনীয় সুশোভিত প্রাসাদ কাদের জন্য? উত্তর এলো, এ সর্ববৃহৎ সর্বোতকৃষ্ট মহলটি হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালাম এর জন্য এবং তার চতুর্দিকের চারটি মহল হচ্ছে তাঁর প্রধান চারজন সহচরের জন্য। এ উত্তর শ্রবণ করে হযরত ইদ্রিস আলাইহিস্ সালাম বললেন, ইয়া বারে এলাহি আমি যদি নবী না হয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালাম-এর উম্মত হতাম তাহলে কতই না উত্তম হতো।

পরবর্তী আলোচনা হযরত ইসহাক আলাইহিস্ সালাম সম্বন্ধে শুরু হলো। হুজুর বললেন, হযরত ইসহাক আলাইহিস্ সালাম যে রাতে মায়ের উদর হতে ভূমিষ্ট হলেন, সে রাতে মূর্তি মন্ডবের সকল মূর্তির মুখ লাল হয়ে গিয়েছিলো এবং সে সব মূর্তি হতে আওয়াজ আসছিলো যে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِسْحَاقُ نَبِىُّ اللّٰهِ-

উচ্চারণ ঃ লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু ইস্হাকুন নবী আল্লাহ।

এরপর বললেন, ইসহাক আলাইহিস্ সালাম যখন পূর্ণ বয়স্ক হলেন তখন তাঁকে পয়গম্বরী দান করা হলো। দিবা-রাত্র সব সময় তিনি ইলাহির ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। সব সময় প্রভুর ভয়ে তাঁর শরীর কাঁপতে থাকতো। নবুয়ত প্রাপ্তির পর সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি মানুষকে আল্লাহ্র পথে নিয়োজিত

হওয়ার জন্য আদেশ উপদেশ দান করতেন এবং রাতে আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকতেন। রাবী হতে বর্ণিত আছে যে এ নিয়মেই তিনি তাঁর অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অপর দিক ছিলো, তাঁর বংশে ৭০ হাজার নবীর আগমন। তিনি বণি ইসরাঈলদের সাহেবে মিল্লাত ছিলেন। অর্থাৎ বণি ইসলাইলগণের ধর্মের উৎপত্তি পুরুষ ছিলো আর আমাদের সাহেবে মিল্লাত হচ্ছে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম।

হযরত এরপর বললেন যে একদিন হযরত ইসহাক আলাইহিস্ সালাম এর অজিফা কাজা হয়ে যাওয়ায় তিনি এতো অধিক ভীত ও দুঃখিত হলেন যে, ৭০ বছর এ জন্য কেঁদে ছিলেন যার ফলে তাঁর অশ্রুর স্রোতে গন্ড দেশের মাংস চামড়া গলে গিয়ে নালা হয়ে গিয়েছিলো। এ ৭০ বছর তিনি সেজদায় কাটিয়েছেন এবং এক সেজদাতে এক বছর বা তার কম বেশী সময় অতিবাহিত করেছেন। একদিন কোন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ইস্হাক তুমি যেভাবে কাঁদছো সেভাবে কি অন্য কেউ কাঁদে? উত্তরে তিনি বললেন, হে মুসলমান ভাই এ ক্রন্দন হচ্ছে কিয়ামতের দিন লজ্জিত হওয়ার ভয়ে। সেদিন যখন আমাকে জীবিত করে আমার পিতা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম এর সম্মুখে উপস্থিত করে তাঁকে বলবে আপনার এ সন্তান অজিফা কাজা করেছিলো। তখন আমি নির্লজ্জ ভাবে কি করে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াবো? একথা বলতে বলতে হযরত যিকরুল্লাহ বিল খায়েরের চোখে অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। এরপর তিনি বললেন আউলিয়া ও আম্বিয়াগণের সূক্ষ্ম ও তুচ্ছ ভুলের জন্যও জবাবদিহি হতে হবে। এ অবস্থাকেই–

حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ হাসানাতুল আবরার সাইয়্যেয়াতুল মুকার্‌রাবিন।

অর্থাৎ–পূণ্যবানদের পূণ্যগুলো পাপের নিকটবর্তী।

এ কারণেই তিনি তাঁর সামান্য একটা ভুলের জন্য এরূপ কেঁদেছিলেন এবং এ নগণ্য অপরাধের জন্য সুদীর্ঘ৭০ টি বছর সেজদায় অতিবাহিত করেছেন। এর কারণ ছিলো শুধু ভুলের ক্ষমা চাওয়া। এরপর বললেন, মানুষের উচিত সর্বাবস্থায় ভীত ও সন্তুষ্টির মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকা।

তারপর বললেন, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিয়ম ছিলো ফজরের নামাজ হতে অবসর হয়ে আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামের ঘটনা বর্ণনা করা। তিনি বলতেন আম্বিয়া ও আউলিয়াদের ঘটনা বলা ও শ্রবণ করা হচ্ছে গুণাহের কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) স্বরূপ। যে ব্যক্তি আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম ও আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহিদের সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করে এবং তাদের তরীকার উপর চলে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের শরীরের জন্য দোজখ হারাম করে দেন। তাঁরা আম্বিয়া আলইহিস সালাম ও আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহিদের সঙ্গে কিয়ামতের দিনে উত্থিত হবেন এবং তাঁদের সঙ্গে এক সাথে বেহেস্তে গমন করবেন। এ কথা বলার সময় আজানের ধ্বনি ভেসে এলো। হযরত মজলিস ত্যাগ করে নামাজে মনোনিবেশ করলেন। অন্যান্যরাও তাঁকে অনুসরণ করলো। মজলিস শেষ হলো।

– আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

পঞ্চম মজলিস

শুক্রবার, ৭ই রমজানুল মোবারক, ৬৮৯ হিজরী। কদমবুসি হাসেল হলো। রমজান মাসের ফজিলত (শ্রেষ্ঠত্ব) সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। সেই সঙ্গে হযরত ইয়াকুব ও ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম এর ঘটনাও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হলো। আলোচনা চলছিলো। হুজুর তখন দরবার কক্ষেই ছিলেন। আমি অধম সেখানে পৌছেই কদমবুসি করলাম। তিনি আমার মাথা উত্তোলন করে আদর করে বললেন শ্রেষ্ঠ কবির পবিত্র আগমন ঘটলো। আমি দ্বিতীয়বার মস্তক কদমে রেখে হযরত মখদুম-এর শুকরিয়া আদায় করলাম। তিনি বসার নির্দেশ দিলেন। এদিন মজলিসে মাওলানা শামসুদ্দিন এহ্ইয়া, মাওলানা ফখরুদ্দীন জারাদী, মাওলানা শাহাবুদ্দিন মুজকর এবং বহু সূফিদরবেশ রহমতুল্লাহি আলাইহিম হযরতের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, রমজান মাস, এক অত্যাশ্চার্য মাস, সারা মাসটিতেই রয়েছে শুধু বরকত (আশীর্বাদ) আর রহমত (আল্লাহ তায়ালার করুণা)। হযরত ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত আছে যে হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, রমযান ছাড়া বছরের এগারটি মাসে যে পরিমাণ করুণা ও বরকত নাজেল হয় সেই সম পরিমাণ বরকত নাজেল হয় রমজান মাসের প্রতিটি দিনে। এরপর বললেন, খা'জা ওসমান হারুনী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজ এর নিয়ম ছিলো রমজান মাস আগমন করার সাথে সাথে দুনিয়ার সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করে সৃষ্টি হতে পৃথক হয়ে যাওয়া। তিনি বলতেন, রমজান মাস রহমতের ভান্ডার হিসেবে আগমন করে। রমজান মাসে নিজে প্রবেশ করার উপমা হচ্ছে, যেন একদল বিজয়ী সৈন্য দখলকৃত এলাকায় প্রবেশ করে দেখতে পেলো সমস্ত ঐশ্বর্য স্থানটিতে ভরপুর, যেভাবে খুশী গ্রহণ করো। রমজান মাসটিও ঠিক তেমনি যে দিকে তাকাও দেখবে শুধু ঐশ্বর্য। নেয়ামত ও বরকতে ভরা। মানুষের উচিত যতদূর সম্ভব রিয়াজত ও মোজাহেদা করা। তাহলে সে এ মাসের ফজিলত ও বরকত অনুধাবন করতে পারবে। এরপর এরশাদ করলেন, খা'জা শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আল্লাইহির অভ্যাস ছিলো প্রত্যেক দিন তারাবীর নামাজের পরে দু'রাকাত নফল নামাজে সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ খতম করা এবং সেই অজুতেই ফজরের নামাজ আদায় করা। বিশ বছর পর্যন্ত তিনি এ

নিয়মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর বললেন, রোজাদার যখন ইফতার করে তখন আল্লাহ তায়ালার ফরমান হয়, আমি তাঁর বংশধর সহ দোজখের অগ্নি হতে মুক্তি দিলাম।

এরপর বললেন, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর ১২ জন সন্তান ছিলো তন্মধ্যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম তাকে সব চেয়ে অধিক ভালবাসতেন। নিজের নিকট হতে দূরে যেতে দিতেন না। ওয়াজ (ধর্মীয় উপদেশ) করার সময় তাকে সম্মুখে বসিয়ে রাখতেন। বড় ভাইয়েরা এতে দুঃখ পেতো। তারা নিজেদের মধ্যে এর প্রতিকারের পরামর্শ করতে লাগলো যে, যে কোন উপায়ে হোক ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে পিতার নিকট হতে দূরে সরিয়ে না দিতে পারলে পিতার অনুগ্রহ বা আদর আপ্যায়ন কিছুই আমাদের ভাগ্যে জুটবে না। এরপর বললেন একদিন রাতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম স্বপ্নে দেখলেন যে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি তাঁকে সেজদা করছে। তিনি এ স্বপ্ন দেখার পর জাগ্রত হলে স্বীয় পিতাকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করালেন। তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম বললেন, হে আমার প্রাণপ্রিয়, এ স্বপ্ন তুমি তোমার ভাইদের নিকট বলো না। কেননা, তাহলে তোমার সমূহ ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يَاَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِىْ سَاجِدِيْنَ - قَالَ يَا بُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلٰى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

এরপর বললেন যে, হে ইউসুফ শয়তান ও পুরনো দুশমন তোমার জ্ঞাতি ভাইয়েরাই। যদি তুমি এ স্বপ্ন তাদের কাছে প্রকাশ কর তাহলে তারা তোমার জীবন পর্যন্ত বিনাশ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ছিলো এটা শৈশবকাল, তাই তিনি তাঁর এ স্বপ্ন ভাইদের নিকট গোপন রাখতে পারলেন না, প্রকাশ করে দিলেন।

স্বপ্ন শ্রবণ করার পর জৈষ্ঠ্য ভ্রাতা অন্যান্য ভাইদেরকে বললো, ইউসূফ আলাইহিস্ সালাম অবশ্যই বাদশাহ হবে এবং এ কারণে পিতা তাঁকে আরও অধিক স্নেহ করবেন। এ নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে পিতার নিকটে এসে বললো আমরা শিকারে যাব। ইউসূফকেও আমাদের সঙ্গে যেতে দিন। না হলে ও মনে দুঃখ পাবে। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম ছেলেদের এ প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের অধিক আগ্রহ দেখে তিনি শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিয়ে বললেন, সাবধান একে কাছ ছাড়া করবে না, সব সময় দেখে রাখবে। দেখো শেষে এমন না হয় যে তোমরা সকলে শিকারে মশগুল রইলে আর এদিকে তাঁকে বাঘে ধরে নিয়ে গেলো। এ কথা বলায় যেন তাদের আঁতে আঘাত লাগলো। এ ঘটনা বলতে বলতে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, যখন দুঃখ-কষ্ট বা বিপদাপদ ঘনিয়ে আসে তখন জ্ঞান লোপ পায়। ঘটনার ভালো দিকটা চোখে পড়ে না এবং আল্লাহ্ তায়ালার কথাও স্মরণ হয় না। যদি আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ হতো তা হলে দুঃখ-দুর্দশা নাজেল হতো না। তারপরও যদি হযরত ইউসূফ আলাইহিস্ সালামকে আল্লাহ্ পাকের নিকট সোপর্দ করে দিতেন তাহলেও তাঁকে এ দুঃখ-কষ্টের কাহিনী শ্রবণ করতে হতো না। কিন্তু তাঁর ছেলেদের নিকট সোপর্দ করলেন যার কারণে তিনি পুত্র বিচ্ছেদ যন্ত্রণার শিকার হলেন। অবশেষে তাঁর ছেলেরা শিকারে গেলো এবং ফেরার পথে ইউসূফ আলাইহিস্ সালামকে একটি কূয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করে এলো। হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম এর প্রতি তখন আল্লাহ্র নির্দেশ হলো, হে জিব্রীল ইউসূফের ভ্রাতৃগণ তাঁকে কূয়ায় নিক্ষেপ করেছে। তুমি যাও সেখানে যেন তাঁর কোন অসুবিধা না হয়। জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম তৎক্ষণাৎ সেখানে চলে গেলেন এবং কুয়ার তলদেশে পতিত হবার পূর্বেই তিনি তাঁকে ধরে ফেললেন এবং কূয়ার মধ্যে একটা নিরাপদ জায়গায় রাখলেন। তারপর একটা খিরকা এনে পরালেন। প্রকৃতপক্ষে খিরকার প্রচলন এখান থেকেই।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর ইউসূফ আলাইহিস্ সালামের ভাইগণ তাঁদের পিতার নিকট এসে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ইউসূফ আলাইহিস্ সালামকে বাঘে নিয়ে গেছে। আমরা বাঘটার পিছু পিছু ধাওয়া করেছিলাম। কিন্তু কোন হদিস করতে পারলাম না। এ খবর শ্রবণ করার সাথে সাথে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। যখন জ্ঞান ফিরলো তখন বলতে লাগলো যে ব্যক্তি সৃষ্টির উপর ভরসা করে এবং স্রষ্টাকে ভুলে যায় তার পরিণাম এরূপই হয়ে থাকে। হায়! যদি বিদায়ের সময় ইউসূফ আলাইহিস্ সালামকে আল্লাহ

তায়ালার নিকট সোপর্দ করতাম তাহলে অবশ্যই সে আমার নিকট হতে পৃথক হতো না। এ কথা বলে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন–

رَضِيْنَا بِقَضَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى -

উচ্চারণ ঃ রাদিনা বিকাদায়িল্লাহি তায়ালা।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিতেই আমার সন্তুষ্টি।

হযরত ইউসূফ আলাইহিস্ সালামের জন্য হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম এতো কেঁদেছিলেন যে ক্রন্দনের ফলে তাঁর চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। লোকজন তাঁর বাড়ীর নাম রেখেছিলো– بَيْتُ الْاَحْزَانِ - বাইতুল আখযান। বাইতুল আখজান অর্থাৎ দুঃখের ঘর। ৪০ বছর পর্যন্ত তাঁর এ অবস্থাতেই কেটেছিলো। তিনি না দিনকে দিন, না রাতকে রাত মনে করতেন। ইউসূফ আলাইহিস সালাম এর বিচ্ছেদে ক্রন্দন করাই ছিলো তাঁর প্রধান কাজ। হযরত খা'জা যিকরুল্লাহ্ বিল খায়ের এ ঘটনা বলতে বলতে হঠাৎ কেঁদে ফেললেন।

এরপর এরশাদ করলেন যে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম এর যখন ক্ষুধা লাগতো তখন তিনি ইউসূফ আলাইহিস্ সালামের নাম নিলেই ক্ষুধা নিবৃত্তি হতো এবং সাত দিন পর্যন্ত আর কোন আহারের প্রয়োজন হতো না। এমতাবস্থায় একদিন হযরত জিব্রীল এসে তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'হে ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম ধরুন আপনি যদি ইউসূফ আলাইহিস্ সালামের সৃষ্টিকর্তা হতেন এবং তাঁর প্রেমে এরূপ নিমগ্ন থাকতেন তাহলে অন্যান্য সৃষ্টির কি অবস্থা হতো। তিনি উত্তরে বললেন, হে ভাই জিব্রীল এ ভর্ৎসনা তোমার প্রথম দিনেই করা উচিত ছিলো। এখন তো দুস্তি ও মুহাব্বতে অন্তর পূর্ণ হয়ে রয়েছে। জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম বললেন, ছেলের প্রতি মুহাব্বত কমিয়ে ফেলুন। তিনি বললেন, এখন তাতে কি লাভ হবে? এ ঘটনা বর্ণনার সময় হযরত খা'জা যিকরুল্লাহ্ বিল খায়েরের চোখ পুনরায় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, আমি আমাদের পীর মুর্শেদের নিকট শুনেছি, আহলে সুলুকদের (তরীকতপন্থী সাধক) নিয়ম হচ্ছে দরবেশ যখন আল্লাহ্ তায়ালার প্রেমের দাবী করে অন্যের প্রতি মনোযোগী হয়, তখন তাদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার বালা মসিবত নাজেল করা হয়। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম নিজেকে আল্লাহ্র প্রেমিক বলে দাবী

করতেন অথচ তাঁর অন্তরে ইউসূফ আলাইহিস্ সালামের প্রেমে ভর্তি ছিলো। এ কারণেই তাঁর পুত্র বিচ্ছেদের মসিবত তাঁর উপর নাজেল করা হয়েছিলো এবং এ 'বালা'র কারণেই তিনি ৪০ বছর বিরহ বেদনার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। এরপর কাঁদতে কাঁদতে যখন এমন পর্যায়ে পৌছলো যে সীমা অতিক্রম করে গেলো, তখন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ এলো, 'যদি ভবিষ্যতে আর ইউসুফের নাম মুখে আন তাহলে তোমার নাম নবীদের তালিকা হতে বাদ দেয়া হবে"। হে দরবেশগণ অনুধাবন করুন। এমন কঠিন আদেশ পালন করা একজন নবী ব্যতীত বোধ হয় অন্য কারও পক্ষে সম্ভব হতো না। এরপর তিনি হযরত ইউসূফ আলাইহিস্ সালাম কে কুয়ার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করার ঘটনায় ফিরে এলেন। বললেন, যখন তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁকে কূয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করে ফিরে এলো, তার একটু পরেই ঐ পথে একদল সওদাগর যাচ্ছিল। তারা ছিলো পিপাসার্ত। কূপটা দেখতে পেয়ে পানি পান করার জন্য তারা এগিয়ে গেলো এবং পানি উত্তোলন করার জন্য বালতি কূয়োর মধ্যে নিক্ষেপ করলো। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম সাথে সাথে বালতি ধরে ফেললেন। তারা বালতিটি টেনে উপরে তুলতেই দেখতে পেলো একটি সুন্দর বালক। তারা জিজ্ঞেস করলো তুমি কে? তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি বনি আদম' অর্থাৎ আদম সন্তান। আমার ঘটনা অনেক লম্বা। এক রাবী (বর্ণনাকারী) বর্ণনা করেছেন যে কূপ থেকে তাঁকে তুলতেই তা প্রচার হয়ে গেলো। হযরত ইউসূফ আলাইহিস্ সালামের জন্মস্থান ছিলো কেনানে (বর্তমান ফিলিস্তিন)। তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ কূপ হতে বালক উদ্ধারের ঘটনা শ্রবণ করে ভাবলো হয়তো তাদের ছোট ভাইকেই উদ্ধার করা হয়েছে। তখন সকলে একত্রিত হয়ে সেই যাত্রী দলের নিকট এসে দেখলো তাদের ধারনা সত্য। তখন তারা বললো এ ছেলে আমাদের গোলাম। সওদাগরেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কি এদের গোলাম? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি এদের গোলাম। সওদাগরেরা তাঁর ভাইদেরেকে বললো তোমরা যদি একে বিক্রি করতে চাও তো আমারা একে কিনতে পারি। তাঁর ভাইদের ইচ্ছাও তাই ছিলো। তারা বিক্রি করার সম্মতি জানালে সওদাগরেরা দাম জিজ্ঞেস করলো। তার ভাইগণ বললো, আপনারা খুশী হয়ে যা দেন তাতেই আমরা রাজি। সওদাগরেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বললো আমরা এর মূল্য ১৭ টি অচল টাকা দিতে পারি। তারা এ মূল্যই উত্তম মনে করে বললো ঠিক আছে তাই দিন। ইউসূফ আলাইহিস্ সালাম এ কথা শ্রবণ করে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, সোবহানাল্লাহ! এটাই আমার প্রকৃত মূল্য। যখন ইউসূফ আলাইহিস্ সালাম এ কথা বললেন তখন আল্লাহ্

তায়ালার ফরমান হলো, হে ইউসূফ তুমি যখন নিজেকে অতি নগণ্যই মনে করেছো, তখন দেখো আমি তোমার মূল্য নির্ধারণ করছি। ঘটনার পূর্বে হযরত ইউসূফ আলাইহিস্ সালাম একদিন আয়নায় নিজের চেহারা দেখে তাঁর অনুপম সৌন্দর্যের জন্য গর্বিত হয়ে উঠেছিলো। যে কারণে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে অচল টাকায় বিক্রি করে তাঁর সৌন্দর্যের অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়েছিলেন। এরপরের ঘটনা হচ্ছে, সওদাগরেরা ইউসূফ আলাইহিস্ সালামকে ক্রয় করে মিশরের এক বাজারে এনে বিক্রির জন্য দাঁড় করালো। তাঁকে ক্রয় করার খদ্দের ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগলো এবং দামও চড়তে লাগলো। বাজারের বেশ একটা কোলাহলের সৃষ্টি হলো। খবরটা শেষ পর্যন্ত মিশরের বাদশাহের কান পর্যন্ত পৌঁছলো। তিনি তাঁর দুষ্প্রাপ্য বস্তু ও বহু নগদ টাকা সহ ইউসূফ আলাইহিস্ সালামকে যে বাজারে বিক্রির জন্য তোলা হয়েছিলো সেখানে গমন করলেন।

بازار حسن جمله خوبان شکسته
ره نیست کزتوہیچ خریدار بگذرد

উচ্চারণ ঃ বাজারে হুসন জুমলা খুবান শিকিস্তা
রাহ নিস্ত কিয তু হিচ খরিদার বগুযারিদ।

অর্থ ঃ অনিন্দ সুন্দর বালক বাজারে এলো
কে আছো, খরিদ্দার, আমার সম্মুখে এসো।
শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁকে অগণিত টাকা পয়সার বিনিময়ে খরিদ করে নিলেন।

আসল কথা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা সব সময়েই বিনয়াবনতা ও নম্রতাকে পছন্দ করেন। আত্মগরিমা বা অহংকারীকে কখনও পছন্দ করেন না। সুতরাং ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম যখন আয়নায় নিজের চেহারা দেখে বলেছিলো, "সোবহানাল্লাহ কি অপরূপ রূপে ও সৌন্দর্যে আমায় সৃষ্টি করেছে। যদি আমায় বাজারে নেয়া হয় তাহলে অবশ্যই এতো অধিক মূল্য হবে যে আমার মূল্য কেউই দিতে পারবে না।" তার এ অহমিকার জন্যই আল্লাহ প্রথমে তাঁর মূল্য নির্ণয় করেছিলেন ১৭ টি অচল টাকা দ্বারা। আর যখন তাঁর সে অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে তার মধ্যে স্থান নিলো বিনয়াবনতা ও নম্রতা তখন আল্লাহ পাক তার মূল্য নির্ধারণ করলেন এক অমূল্য সম্পদ রূপে।

ইউসূফ আলাইহিস্ সালাম যখন দেখলেন যে তাঁর মূল্য অগণিত টাকার তোড়া, তখন মনে মনে আফ্সোস করে বললেন, 'আজ যদি আমর ভাইগণ

উপস্থিত থাকতো তা হলে আমার মূল্য দেখতে পেতো।' যেই মাত্র তিনি এ কথা বললেন, সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম-এর মাধ্যমে ওহী পাঠালেন, 'হে ইউসূফ তোমার মূল্য পূর্বেরটাই ঠিক যা তোমার ভাইদের সম্মুখে নির্ধারণ করা হয়েছিল'।

এরপর হযরত খা'জা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের বললেন, আল্লাহ তায়ালার এ ওহী ছিলো তাঁর জন্য সতর্ক বাণী। যাতে তাঁর মনের মাঝে পুনরায় অহঙ্কার সৃষ্টি না হয়। তিনি আরও বললেন যে যাঁরা আল্লাহ তায়ালার দীদারপ্রাপ্ত তাঁদের এমন অবস্থায় এরূপ সম্মানই লাভ হয়ে থাকে।

এরপর বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা যখন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামকে পুত্র বিচ্ছেদে মৃত্যু হতে বাঁচাতে চাইলেন তখন তাঁর পুত্রদের মারফত তাঁর ছেলের জীবিত থাকার সংবাদ তাঁকে দেয়া হলো। সংবাদ পেয়ে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম মিসর যাত্রা করলেন। মিসর পৌঁছে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। হযরত ইউসূফ আলাইহিস্ সালাম সৈন্য পরিচালনা করছিলেন, সৈন্যগণ সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি প্রত্যেকটি দলে তাঁর ছেলের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। তাঁর ধারণা ছিলো তাঁর ছেলে ইউসূফ আলাইহিস্ সালাম হয়তো এরই মধ্যে কোথাও আছে। সৈন্যগণ তাঁকে অতিক্রম করার পর ইউসূফ আলাইহিস সালামের ঘোড়া দেখা গেলো। তিনি তাঁর পিতা ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামকে দেখামাত্র ঘোড়া হতে অবতরণ করলেন। এদিকে তাঁর পিতার দৃষ্টিও তাঁর প্রতি পতিত হওয়ায় তিনি দৌড়ে তাঁর দিকে আসতে লাগলেন এবং উভয়ে উভয়কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এমন সময় হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম উপস্থিত হয়ে হযরত ইউসূফ আলাইহিস্ সলামকে বললেন, হে ইউসূফ আলাইহিস্ সালাম আপনি ঘোড়া হতে নামতে দেরী করেছেন, তাড়াতাড়ি করেননি তাই আপনার বংশে কোন পয়গম্বর হবে না। অবশেষে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম যখন আলিঙ্গন করলেন তখন দেখলেন যে ইউসূফ আলাইহিস্ সালাম অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল, যেন একমুষ্ঠি হাড্ডি। তিনি ছেলের এ অবস্থা দেখে অত্যন্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হয়ে বললেন, "আমার ধারণা ছিলো তুমি অতো ঐশ্বর্যে ও প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে অবশ্যই মুটিয়ে গেছো। কিন্তু তোমার এমন কি ঘটেছে যার জন্য তোমার স্বাস্থ্যের এ দুর্দশা? পিতার প্রশ্নের উত্তরে ছেলে বললেন, আপনার অনুমান হয়েতো ঠিকই হতো, কিন্তু আমি যখন আহার করার জন্য খাদ্যে হাত লাগাতাম তখন জিব্রীল এসে আমাকে ভর্ৎসনা করে বলতো 'হে ইউসূফ তোমার বিচ্ছেদে তোমার

পিতা পানি পর্যন্ত পান করেন না আর তুমি পেট পুরে খাবে? তোমার উচিত আহার না করা। এ কথা শ্রবণ করলেই আহার আমার নিকট বিষের মতো মনে হতো। আজ পর্যন্ত আমি সেই একই অবস্থায় কাটাচ্ছি। হযরত এরপর বললেন আল্লাহ্ তায়ালা সৌন্দর্যকে ২০ ভাগ করে তার ১৯ ভাগ প্রদান করেছেন হযরত ইউসূফ আলাইহিস্ সালামকে এবং ১ ভাগ প্রদান করেছেন অন্যান্যকে। হযরত ইউসূফ আলাইহিস্ সালামের গায়ের রং এতো উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ ছিলো যে তিনি আহার গলাধঃকরণের সময় কণ্ঠ নালীর ভিতর দিয়ে তা প্রবেশ করতে দেখা যেতো।

এরপর বললেন, ইউসূফ আলাইহিস্ সালামের শাসনামলে একবার দেশে ভীষণ আকাল দেখা দিলো এবং সে আকাল ১২ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। জনসাধারণ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়ে অনাহারে ক্লিষ্ট-প্লিষ্ট হয়ে মরতে লাগলো। হযরত ইউসূফ আলাইহিস্ সালাম এ অবস্থা দেখে মোনাজাত করলে হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালাম উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে ইউসূফ, দুর্ভিক্ষে লোকজন মারা যাবে এবং মরতেই থাকবে, আল্লাহ্ তায়ালার ফরমান হয়েছে তোমার উচিত কোন উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা যাতে লোকজন তোমার চেহারা দেখতে পায়। তুমি তাদেরকে ডেকে এক স্থানে জড়ো করো। তারা তোমাকে দেখলে বালা হতে নাজাত পাবে। ঘটনা এরূপই ঘটেছিলো। সংবাদ পেয়ে দলে দলে লোকজন এসে তাঁকে দেখে বিপদমুক্ত হয়ে চলে যাচ্ছিল। তাঁকে দেখার পর লোকজনের ক্ষুধা এভাবে নিবারণ হতে লাগলো যে, পরবর্তী সাতদিন আর তাদরে ক্ষুধা পেতো না। তাঁকে দেখে সৌন্দর্যের তেজদীপ্তে সবাই সাতদিন পর্যন্ত বিভোর হয়ে থাকতো। এ ঘটনা বর্ণনা করতে করতে খা'জা যিকরুল্লাহ বিল খায়েরের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি বলতে লাগলেন যে আহ্লে সুলুক (তরীকতপন্থী সাধকগণ) এ ঘটনাকে কিয়ামতের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। যেমন ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের চেহারা দর্শনে সাতদিন সৌন্দর্যের তাজাল্লীতে বিভোর থাকতো। তেমনি কাল কিয়ামতে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর করুণা ও দয়া দ্বারা মোসলমানদেরকে বেহেস্তে প্রবেশ করায়ে তাদেরকে নিজের তাজাল্লী দান করবেন এবং ঐ দর্শনের ঐশ্বর্যে ভাগ্যবান করাবেন। তাঁর তাজাল্লী একবার দেখার পর বেহেস্তবাসীরা ৭০ হাজার বছর পর্যন্ত নেশায় অচেতন হয়ে পড়ে থাকবে।

এরপর বললেন, হযরত ইউসূফ আলাইহিস্ সালামকে যখন তাঁর পিতা গোসল করাতেন তখন চতুর্দিকে ভালো করে পর্দা লাগিয়ে তারপর গোসল করাতেন যাতে অন্য কারও চোখে না পড়ে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সওদাগরদের

নিকট বিক্রি হওয়ার পর পুনরায় বিক্রীর পূর্বে সওদাগরগণ তাঁকে বললো, যাও গোসল করে এসো। হযরত ইউসূফ আলাইহিস্ সালাম পানিতে কদম মোবারক রাখতেই কেঁদে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন, সোবহানাল্লাহ! আমার পিতা আমাকে এমন হেফাজত করতেন যে গোসলের সময় চতুর্দিক দিয়ে পর্দা দিয়ে নিতেন। অথচ আজ আমার শরীর পানির প্রাণীরাও দেখবে। যখন তিনি এ চিন্তা করছিলেন তখন হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালামের প্রতি হুকুম হলো, 'যাও নূরের পর্দা ইউসূফ আলাইহিস্ সালামের চতুর্দিকে দাঁড় করিয়ে দাও যাতে পানির প্রাণীরা তাঁর শরীর না দেখতে পায়। হযরত খা'জা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের এ ঘটনা বর্ণনার পর তাঁর চোখ অশ্রুতে ভরে গেলো। এরপর বললেন যে প্রত্যেক সম্মানী লোকই শেষ পর্যন্ত তাঁর সম্মান লাভ করে থাকেন। হতভাগাদেরও ইজ্জত দেয়া হয় যারা আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে। এভাবে যারা সম্মান অর্জন করে সম্মানিত হয় তাদের সম্মান কখনও ক্ষুণ্ন হয় না। হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের এ পর্যন্ত বলার পর তাঁর কক্ষে গমন করলেন। মজলিস এ দিনের মতো বরখাস্ত হলো।

– আল্হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

ষষ্ঠ মজলিস

বৃহস্পতিবার, ২০ শে রমজানুল মোবারক, ৬৮৯ হিঃ। আলোচনা চলচিলো হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম সম্বন্ধে। কদমবুসির দৌলত লাভ করলাম। মাওলানা শামস্উদ্দিন এহ্ইয়া, মাওলানা বোরহানউদ্দিন গরীব ও অন্যান্য গণ্যমান্য সূফি দরবেশগণ পবিত্র মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। হযরত বললেন, যখন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম দু'রাকাত শুক্রানার নামাজ ইসমাইল আলাইহিস্ সালাম এর দুনিয়ায় আগমন উপলক্ষে পবিত্র কাবা ঘরে পাঠ করলেন তখন জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম অবতরণ করে বললেন, হে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ তোমার ছেলে নবী হবে। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম এ সংবাদে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। এরপর তিনি হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালামকে প্রশ্ন করলেন, হে ভাই জিব্রীল, এ ছেলের আউলাদ হতে কি পরিমাণ নবী হবে? উত্তরে তিনি বললেন, এর নসল (বংশ) হতে কোন নবী হবে না। তিনি একথা শ্রবণ করে ব্যথিত হলেন। তাঁর দুঃখের কারণে হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম পুনরায় ওহী নিয়ে এলেন, 'হে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ পাকের আদেশ হয়েছে হযরত ইসমাইল আলাইহিস্ সালামের বংশ হতে এমন একজন নবীকে পয়দা করবেন, যার খাতিরে আল্লাহ কুল মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। যিনি সকল নবীর নবী–শেষ জামানার সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আসমান, জমীন ও সমস্ত জগত এবং সমস্ত জগতের সকল বস্তু তাঁর জন্য এবং তাঁর পবিত্র নূর হতে সৃষ্টি করেছেন। হে ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম তিনি যদি তাঁকে সৃষ্টি না করতেন তা হলে কোন কিছুই সৃষ্টি করতেন না। একথা শ্রবণ করে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম অত্যন্ত খুশী হলেন।

এরপর বললেন যেদিন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম হযরত ইসমাইল আলাইহিস্ সালামকে কোরবানী করার জন্য কোরবানী করার স্থানে নিয়ে গেলেন, সেদিন তিনি হাত পা না বেধেই কোরবাণী করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু হযরত ইসমাইল আলাইহিস্ সালাম বললেন, হে পিতা আমার হাত পা বেঁধে দিন। কেননা আমার ভয় হচ্ছে যদি কোরবাণীর সময়ে যন্ত্রনায় হাত পা ছুড়ি তা হলে তা আল্লাহ্পাকের নাফরমানী হবে এবং আমার জন্য শেষে আপনি আম্বিয়াদের নিকট লজ্জিত হবেন এবং কিয়ামতের দিন এ সম্বন্ধে আপনাকে বলা হবে তোমার এ প্রেম বিশুদ্ধ ছিলো না। (সোবহানাল্লাহ্!)

এরপর বললেন, হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর মাথার উপর যখন করাত রেখে তাঁর উম্মতগণ তাঁকে চিড়তে শুরু করলো তখন তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ্‌র নির্দেশ এলো, "হে যাকারিয়া যদি মুখে 'আহ' শব্দটি উচ্চারণ করো তাহলে তোমার নাম আম্বিয়াদের তালিকা হতে বাদ দিয়ে দেয়া হবে।"

পরবর্তী আলোচনা ছিলো 'দোয়া' সম্বন্ধে হযরত বললেন, যখন আদম আলাইহিস্ সালাম অপরাধ খন্ডনের জন্য দোয়া চাইলেন, তখন ইলাহির হুকুম হলো, "হে আদম যে পর্যন্ত তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করে দোয়া না চাইবে সে পর্যন্ত তোমার দোয়া কবুল হবে না"। এরপর তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করে দোয়া চাইলেন এবং সাথে সাথে তাঁর দোয়া কবুল হলো। কুরআনের বাণীটি নিম্নরূপ–

فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ـ

উচ্চারণ ঃ ফাতালাক্কা আদামু মির রাব্বিহি কালিমাতিন ফাতাবা আলাইহি।

অর্থ ঃ কোরান ব্যাখ্যাকারীগণ এর ব্যাখ্যায় কেউ লিখেছেন যে সে বাক্যটি।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ ـ

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালাতু আলান্নাবিয়িল উম্মি ছিলো।

আবার কেউ লিখেছে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ ـ

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মদ। হে দরবেশগণ, যদি দোয়ার শর্ত পূরণ করে দোয়া চাওয়া হয় তাহলে অবশ্যই দোয়া কবুল হয়; হাদিস শরীফে এ কথা বর্ণিত আছে। তাছাড়া আল্লাহ্‌র কালামে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ـ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْاِجَابَةِ ـ

উদ্‌য়ুনি আসতাজিব লাকুম ইন্নাল্লাজিনা ইয়াসতাক বেরুনা আন ইবাদাতি সাইয়াদ খুলুনা জাহান্নামা দাখেরীন। ওয়াল্লাহু ওয়ালিউল ইজাবাত।

এপর বললেন, শায়খ হেরাতের একজন মুরীদ ভ্রমণে গিয়েছিলো। ষাট বছর ভ্রমণে অতিবাহিত করর পর শায়খের খেদমতে হাজির হলো। তার শায়খ তাকে জিজ্ঞেস করলেন এতো দীর্ঘ ভ্রমণে তুমি কোন্ কোন্ বুজুর্গের দর্শন লাভ করেছো? উত্তরে মুরীদ বললো, আমি কুতুবুল আলমের দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছি। শায়খ হেরাত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলে, কামেল বীর পুরুষ কে এবং অর্ধ্ব কামেল কে"? উত্তরে তার মুরিদ বললো আমি অবশ্যই তাঁকে তা জিজ্ঞেস করেছি; তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "তিনিই কামেল বীরপুরুষ যে কষ্ট করে একটা জিনিস অর্জন করে এনে নিজের ভাইদের জন্য রাখে এবং সকলে তা গ্রহণ করে এবং অর্ধ্ব কামেল সে যে, হাওয়ায় ভর করে উড়তে পারে এবং পানিতে জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়তে পারে"।

এরপর বললেন, একবর হযরত খা'জা হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন দজলা নদীর তীরে পৌছে ছিলেন তখন নামাজের সময় হয়ে গিয়েছিলো। এ সময় হযরত খাজা হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত বিবি রাবেয়া বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি এক সঙ্গে ছিলেন। হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি পানির উপর জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়তে লাগলেন। হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি নামাজ শেষ করে চারিদিক তাকিয়ে হযরত রাবেয়া বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে অনুসন্ধান করতে লাগলেন কিন্তু কোথাও দেখতে পেলেন না। অবশেষে তাঁর দৃষ্টি যখন উপরে দিকে নিক্ষেপ হলো তখন দেখলেন হযরত রাবেয়া বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি হাওয়ার উপর জায়নামায বিছিয়ে তাতে নামাজে রত রয়েছেন। নামাজ শেষে তিনি প্রশ্ন করলেন, রাবেয়া এটা তুমি কি দেখালে? উত্তরে তিনি বললেন, আপনি কি দেখালেন? প্রশ্ন ও প্রশ্নের উত্তর শেষ হওয়ার পর হযরত রাবেয়া বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, হে হাসান, পানির উপর চলতে পারা তো খড়-কুটোর কাজ, তারাও পানির উপর ভেসে থাকতে পারে আর হাওয়ার উপর চলতে পারা তো সামান্য একটা মাছির সমতুল্য কাজ। কেননা সেও হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে পারে। নিজ অন্তর যদি নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো তাহলে বুঝা যেতো যে কিছু একটা

কৃতিত্ব আছে অর্থাৎ যদি উলুল-আযম হতে পারা যেতো বা চিরঞ্জীবের মহিমা হওয়ার মতো কোন কর্ম থাকতো তা হলে বলতে পারা যেতো যে কিছু ঐশ্বরিক শক্তি সঞ্চয়ে অগ্রনী ভূমিকা পালন করা হয়েছে। (সোবহানাল্লাহ!)

হযরত খা'জা এরপর বললেন, এক বুজুর্গের সাথে হযরত খিজির আলাইহিস্ সালামরে দেখা-সাক্ষাৎ হতো। একদিন কথা প্রসঙ্গে সেই বুজুর্গ প্রশ্ন করলেন, আপনি তো হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর সময়ও ছিলেন। তাঁকে দেখেছেন এবং তার সম্বন্ধে অনেক জানেনও তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলুন না? হযরত খিজির আলাইহিস্ সালাম বললেন, আমি তাঁর মুখে সোহবত সম্বন্ধে শুনেছি। তিনি বলেছিলেন–

يَا خَضِرُ مَنْ ظَنَّ اَنَّهُ خَيْرٌ مِنَ الْكَلْبِ لَا يَصْلُحُ الصُّحْبَةَ مَعَهُ -

উচ্চারণ ঃ ইয়া খাজিরু মান জান্না আন্নাহু খায়রুম মিনাল কাল্বি লাইয়াছলুহু ছুহবাতা মায়াহু।

অর্থাৎ হে খিজির যে গর্ব করে যে, আমি শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গ একটা কুকুরের চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়।

এ ঘটনা বলার পর আযান হয়ে গেলো হুজুর নামাজে মনোনিবেশ করলেন। মজলিস বরখাস্ত হলো।

– আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

সপ্তম মজলিস

৫ই শওয়াল, শনিবার, ৬৮৯ হিঃ। কদমবুসির সৌভাগ্যে ভাগ্যবান হলাম। মাওলানা শামসুদ্দিন এহ্ইয়া, মাওলানা ফখরুদ্দিন জারাদী, আমীর হাসান সঞ্জীর এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সূফিগণ (রহ্মহুমুল্লাহ) মজলিস শরীফে উপস্থিত ছিলেন। হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। হুজুর এরশাদ করলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম তাঁর প্রতি নাজিলকৃত ঐশীগ্রন্থ জবুর পাঠ করতে ছিলেন। যখন তিনি 'বালা' (দুঃখ-কষ্ট) সম্বন্ধে পাঠ করতে লাগলেন যে, আল্লাহ্ বলেন, 'বালা' আমি আমার বন্ধুদের জন্য সৃষ্টি করেছি। যারা আমার বন্ধু তারা এ 'বালা' সন্তুষ্ট চিত্তে আকাঙক্ষা করবে এবং বালা নাজেল হলে তাঁরা ধৈর্যধারণ করবে।' আল্লাহ্ তায়ালার এ কালাম পাঠ করার পর তিনি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট 'বালা' কামনা করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম উপস্থিত হয়ে বললেন, হে দাউদ 'বালা' কামনা করছো ঠিকই কিন্তু বালা সহ্য করার ক্ষমতা আছে কি? উত্তরে দাউদ আলাইহিস্ সালাম বললেন যে আমি ভরসা করছি যে, আমার প্রতি বালা নাজিল হলে আমি ধৈর্যধারণ করতে পারবো। এর পরের কোন একদিনের ঘটনা হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম জবুর পাঠে রত ছিলেন, আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ এলো, 'হে দাউদ বালা গ্রহণ করার জন্য তৈরী হয়ে যাও। আজ তোমার প্রতি বালা নাজিলের দিন।' এরপর দুপুরে যখন হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম যবুর পাঠ করছিলেন তখন হঠাৎ একটা অতি সুন্দর পাখির প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। পাখিটি দেখতে যেমন সুন্দর তার রংটাও তেমন চমৎকার। এমন সুন্দর পাখি আর কোন দিন তাঁর চোখে পড়েনি। পাখিটি উড়ে এসে একবারে তাঁর সম্মুখে বসে পড়লো। পাখিটির অপরূপ দৃশ্য দেখে তিনি ভাবলেন এমন চমৎকার পাখিটি যদি ধরা যেতো তা হলে সুলাইমানকে দেয়া যেতো। আহাঃ কি সুন্দরইনা পাখিটা। শেষ পর্যন্ত তাঁর চিন্তা ও সংকল্প বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে উঠলো। পবিত্র জবুর কিতাবটি বন্ধ করে উপরে তুলে রাখলেন এবং জায়নামাজটি গুটিয়ে রেখে পাখিটি ধরার জন্য এগিয়ে গেলেন কিন্তু পাখিটি উড়ে যেয়ে সিঁড়ির উপর বসলো। তিনিও আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে উপরে উঠার সিঁড়ির উপর পা

বাড়ালেন কিন্তু পাখিটি ধরতে পারলেন না। পাখিটি সেখান থেকে উড়ে যেয়ে দু'তলার উপর বসলো। তিনিও পাখিটিকে অনুসরণ করতে করতে উপরে চলে গেলেন। ঘটনাচক্রে তখন তাঁর উম্মত আউরিয়ার স্ত্রী সেখানে নিজের মাথা ধুয়ে পরিষ্কার করছিলো। স্ত্রীলোকটি তখন উলঙ্গ ছিলো। সে লোকের পায়ের শব্দ পেয়ে মাথা ঝাকুনী দিতেই তার মাথার ঘন ও সুদীর্ঘ চুল তার দেহ আবৃত করে ফেললো। হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম এ দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং মুখে বললেন, সোবহানাল্লাহ! এমন অপরূপ সৌন্দর্য যার কেশ গুচ্ছে সে নিজে না জানি কত সুন্দর। এ দৃশ্য দর্শনে আউরিয়ার স্ত্রীকে নিজের করে পাওয়ার জন্য তাঁর অন্তরে লোভ সঞ্চারিত হলো। এ লোভ শেষ পর্যন্ত তাঁর ধৈর্য, বিশ্রাম ও শান্তি হরণ করে নিলো। আউরিয়ার স্ত্রীকে লাভ করর জন্য তিনি আউরিয়াকে এক যুদ্ধে প্রেরণ করলেন এবং আউরিয়া সেই যুদ্ধে শহীদ হলো। অবশেষে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আউরিয়ার স্ত্রীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলে আউরিয়ার স্ত্রী সে প্রস্তাব গ্রহণ করলো এবং বিবাহের মাধ্যমে দাউদ আলাইহিস্ সালাম আউরিয়ার স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী রূপে লাভ করে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

এ ঘটনার বেশ কিছু দিন পর একদিন দুই বিবাদমান ব্যক্তি তাঁর নিকট তাদের ঝগড়ার মিমাংসার জন্য বিচার চাইলো। অভিযোগকারী বললো, হযরত আমার সংগের এ লোকটির নিরানব্বইটি ভেড়া আছে; আর আমার ছিলো মাত্র একটি। সে একটি ভেড়াও এ লোকটি আমর নিকট হতে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে। আপনি বলুন এটা অন্যায় কিনা? হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম বলেন, 'এটা অত্যন্ত অন্যায়' এবং বিবাদীকে বললেন, 'তুমি ওর ভেড়া ফেরৎ দিয়ে দাও কেননা তুমি এ গরীবের উপর অত্যাচার করেছো। আগন্তুক দু'জন এ রায় শ্রবণ করর সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তখন হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম ভাবলেন এরা তো মানুষ নয়, নিশ্চয়ই ফেরেস্তা এবং এ ঘটনা আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে, কারণ আমার ৯৯ জন স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্যেও আর একজনের একমাত্র স্ত্রীকে জোরপূর্বকের মতোই গ্রহণ করেছি। একথা চিন্তা করতে করতে তিনি অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন এবং নিজের সন্তানদের জন্য দোয়া করলেন। তারপর জংগলে চলে যেয়ে মাথা সেজদাবনত করে স্বীয়কৃত অপরাধের জন্য একাধারে বাইশ বছর ক্রন্দন করলেন। বাইশ বছর পর ইলাহি

ফরমান হলো, 'হে দাউদ কাঁদছো কেন? তিনি বিনয়ে প্রার্থনা করলেন, 'ইয়া ইলাহি যে চোখ দিয়ে পরস্ত্রীর উপর নজর পড়েছিলো সেই চোখের পানি দ্বারা তার প্রতিকার চাচ্ছি।

শ্লোক

گر حشم ندیدے نشدے خانہ خراب
بس خانہ کہ شد خراب ازکردہ چشم۔

উচ্চারণ ঃ গর চশমে না দিদে না শুদি খানা খারাব
বস খানা কে শুদ খারাব আয করদাহ চশম।

অর্থ ঃ যদি না দেখতো চোখ মোর হতো না খারাপ এ ঘর
ঘর মোর খারাপ হলো আজ চোখেরই কারণ।

বর্ণিত আছে যে তিনি এমন ভাবে কেঁদেছিলেন যে তার পবিত্র মুখ মন্ডলের চামড়া ও মাংস গলে গিয়েছিলো। তখন আল্লাহর নির্দেশ এলো, "হে দাউদ, আমি তোমর তওবা কবুল করবো কিন্ত শর্ত হচ্ছে আউরিয়াকে তোমার সন্তুষ্ট করতে হবে। হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম এ আদেশ পেয়ে যেখানে আউরিয়াকে দাফন করা হয়েছিলো সেখানে গেলেন। সেখানে একটা কূয়া ছিলো তিনি সেই কূয়ার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আউরিয়া তুমি কি আমার উপর সন্তুষ্ট? সাথে সাথে উত্তর এলো "হ্যাঁ, আমি আপনার উপর সন্তুষ্ট।" এমন সময় আল্লাহ পাকের হুকুম এলো, 'হে দাউদ, তুমি এভাবে জিজ্ঞেস করলে হবে না। তোমার অন্যায়ের কথা উল্লেখ করে তার নিকট মাফ চাও। যদি সে মাফ করে দেয় তাহলে তোমার তওবা কবুল হবে। যা হোক, আসলে তাঁর তওবা কবুল হওয়ার সময় হয়েছিলো, তাই আল্লাহ তায়ালা আউরিয়ার অন্তরে করুণা সঞ্চার করে দিলেন। হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম পুনরায় কূয়ার নিকট যেয়ে বললেন, "হে আউরিয়া আমি তোমাকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়েছিলাম এ জন্য যে তুমি যুদ্ধে শহীদ হলে আমি তোমার স্ত্রীকে বিয়ে করবো। আমার অপরাধের জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করতে পার কি না?" উত্তরে আউরিয়া বললো। 'হে দাউদ আলাইহিস্ সালাম আমি আপনাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মাফ করে দিলাম।" আউরিয়া এ কথা বলার সাথে সাথে হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের তওবা কবুল হলো।

এরপর হযরত খা'জা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের এরশাদ করলেন যে হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন যখন তিনি পবিত্র জবুর পাঠ করতেন। তখন তাঁর সুমধুর আওয়াজে উড়ন্ত পাখিগুলোও থেমে যেয়ে তা শ্রবণ করতো এবং তাঁর মাথার উপর ছায়া দান করতো। তাঁর প্রাণ-মাতানো কণ্ঠের আওয়াজে শ্রোতারা সকলে বেহুস হয়ে যেতো। যখন তাঁর বেছালতের (মৃত্যু) সময় নিকটবর্তী হলো তখন হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম উপস্থিত হয়ে কাগজে লিখিত সহিফা (ক্ষুদ্র পুস্তিকা) তাঁকে দান করলেন। সহিফাটির মধ্যে বিশটি মসলা লিখা ছিলো। হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম বললেন, এটা আল্লাহপাকের ফরমান (আদেশ)। আপনি আপনার যুবক ছেলেদেরকে এসব মসলার উত্তর দিতে বলুন। এদের মধ্যে হতে আপনার যে ছেলে সমস্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবে সে আপনার পরে খেলাফত (সনদ) পাবে এবং তাকেই আপনি রাজ্য পালনের পরিচিতি আংটিটি দান করবেন। নির্দেশ মোতাবেক তিনি তাঁর সমস্ত সন্তানদেরকে ডেকে পাঠালেন। এবং একজন একজন করে প্রত্যেককে সেই বিশটি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কেউই সব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে পারলো না। অবশেষে যখন হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামকে প্রশ্ন করা হলো তখন তিনি বিশটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর প্রদান করলেন। এ ঘটনা প্রসেঙ্গ হযরত খা'জা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের বললেন। যেহেতু اَلْجَدُّ (ভাগ্য) আযলে এ সৌভাগ্য হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম-এর জন্য লিখাছিলো তাই প্রশ্নের উত্তরগুলোও তাঁকেই প্রদান করা হয়েছিলো এবং তিনিই পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন। হে দরবেশগণ,তিনি কিরূপ শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ দেশ পেলেন যে রকম দেশ শাসন করার ক্ষমতা তাঁর আগে বা পরে আর কারও ভাগ্যে জুটেনি।

এরপর বললেন, হক তায়ালা (আল্লাহ তায়ালা) হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামকে এমন জ্ঞান ও শক্তি প্রদান করেছিলেন যে তিনি জল, স্থল ও আকাশের সকল প্রাণীদের ভাষা বুঝতে পারতেন ও বলতে পারতেন এবং জগতের সর্বস্থানের সকল প্রাণীই তাঁর অনুগত ছিলো। জ্বিন, ইনসান, দৈত্য, দানব, মৎস, পশু, পাখি ও প্রাণী জগতের সকলেই তাঁর আদেশ পালনে বাধ্য থাকতো। তাঁর একটি বিরাট আকারের সিংহাসন ছিলো (যাকে তখ্‌তে সোলাইমান বলা হয়) যার মধ্যে বার হাজার বনি ইসরাইল এক সঙ্গে বসতে

পারতো। তিনি সেই সিংহাসনে ১২ হাজার লোক নিয়ে এক সঙ্গে বসতেন এবং হাওয়াকে আদেশ করতেন উড়িয়ে নিয়ে যেতে। হাওয়া আদেশ পাওয়া মাত্র এক মাসের রাস্তা এক দিনে অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেতো। হযরত সোলায়মান আলাইহিস্ সালাম প্রতিদিন যে পরিমাণ লোকদেরকে আহার করাতেন তাদের সংখ্যা নিরূপণ না করে এ কথা বলা যায় যে তাদের আহারের জন্য প্রতিদিন যে পরিমাণ লবনের প্রয়োজন হতো তার পরিমাণ হচ্ছে ৭০ হাজার উটের বোঝা। অর্থাৎ প্রতিদিন ৭০ হাজার উট প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় লবণ বহন করে আনতো। এর পরিমাণ হতেই আহার্য দ্রব্যের পরিমাণ ও লোকসংখ্যার পরিমাণ অনুমান করা যেতে পারে। তিনি নিজে তাঁর নিজস্ব খরচের জন্য ব্যাগ তৈরি করে তা বাজারে বিক্রি করে সেই বিক্রিত অর্থের মুনাফা দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। রাতে দরবেশদের খেদমতের জন্য মসজিদে গমন করতেন। গরীব দুঃখীদের খোজ খবর সব সময়ই নিতেন এবং তাদের নিকট নিজের জন্য দোয়া চাইতেন।

হযরত খা'জা এ পর্যন্ত বলে আল্লাহতে বিলীন হলেন। মজলিস সমাপ্ত হলো।

–আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

অষ্টম মজলিস

বৃহস্পতিবার, ২০শে শওয়াল, ৬৮৯ হিজরী। কদমবুসির সৌভাগ্যে ভাগ্যবান হলাম। মাওলানা শামস্উদ্দিন এহ্ইয়া, মাওলানা বোরহানউদ্দিন গরীব, মাওলানা ফখরুদ্দীন জারাদী, শায়খ নাসিরুদ্দিন মাহ্মুদ, মাওলানা ইউসূফ কোল্লাখড়ী ও অন্যান্য বিশিষ্ট সূফি দরবেশ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। হযরত এরশাদ করলেন, যে রাতে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম পয়দা হলেন সে রাতে ফেরাউন স্বপ্ন দেখে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসলো এবং তখনই উজিরকে ডেকে পাঠালো। উজির খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। ফেরাউন তাকে বললো, "আমি স্বপ্নে দেখলাম, এইমাত্রই সেই ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ হলো, যে আমার রজত্ব ধ্বংস করে দিবে। বর্ণিত আছে যে ফেরাউনের কড়া নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যখন তার রাজ্যে সেই মহান নবী মাতৃজঠরে প্রবেশ করলেন, তখন বনি ইসরাইলদের প্রতি সে হুকুম দিয়েছিলো, যে সব নারী গর্ভধারণ করেছে তারা গর্ভপাত ঘটাক এবং যে কোন সন্তান এর মধ্যে ভূমিষ্ঠ হবে তার সংবাদ তাকে দিতে হবে এবং সাথে সাথে সে সন্তানের মৃত্যু ঘটাতে হবে। ফেরাউনের নির্দেশ মোতাবেক হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের জন্মের সংবাদও তাকে দেয়া হলো। ফেরাউন নিজে তাঁদের বাড়িতে এসে উনুনে অগ্নি প্রজ্বলিত করে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে সেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করে এবং কয়েকজন লোককে সেখানে পাহারায় রেখে চলে গেলো। অনেকক্ষণ পর পাহারাদার শিশুকে মৃত মনে করে চলে গেলো। অগ্নি নির্বাপিত হওয়ার পর হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম এর ভগ্নি উনুনের নিকট এসে দেখলো শিশুটি মরেনি বরং হাত পা নেড়ে মনের সুখে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুষছে। সে দৌড়ে যেয়ে তার মাকে এ শুভ সংবাদ দিলো। সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর শিশুকে উনুন হতে বের করলেন এবং ফেরাউনের ভয়ে দোলনার উপর রেখে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সোপর্দ করে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। তখন নদীর তরঙ্গের প্রতি আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন, "হে তরঙ্গ এ শিশুকে ফেরাউনের প্রাসাদের নিকট নিয়ে যাও। নির্দেশ পাওয়া মাত্র তরঙ্গ আদেশ পালন করলো। ফেরাউন এবং তার বেগম আছিয়া মহলের বাইরে নদীর কিনারায় বসে ছিলো। হঠাৎ নদীবক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পেলো একটি ভাসমান দোলনা হাওয়ায় তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। আছিয়ার কৌতুহলী মন সজাগ হয়ে উঠলো। সে স্বামীকে বললো, "ফেরাউন দেখনাগো দোলনাটির মধ্যে কি আছে?" ফেরাউন এ

মাঝিকে ডেকে নির্দেশ দিলো দোলনাটিকে নদী থেকে তুলে তার নিকট নিয়ে আসতে। নির্দেশ পাওয়া মাত্র মাঝি দোলনাটিকে তুলে এনে ফেরাউনের সম্মুখে রাখলো। দোলনাটি ছিলো কাঠের এবং চতুর্দিক থেকে বন্ধ ছিলো। দোলনাটি খোলার পর দেখা গেলো ভিতরে শায়িত অনিন্দ্যসুন্দর এক শিশু। নিজের আঙ্গুল মুখে পুরে ঘুমোচ্ছে। ফেরাউন তাঁর চেহারা দেখতেই ভীত হয়ে পড়লো এবং আছিয়াকে বললো, " হে আছিয়া এ সন্তান যদিও আমাদের জন্য দান স্বরূপ কিন্তু আমাদের জন্য মঙ্গলজনক নয়"। আছিয়া বললো, "হে নাদান, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নিঃসন্তান রাখার পর আজ করুণা করে এ শিশুকে আমাদের জন্য দান স্বরূপ পাঠিয়েছেন এ জন্য যে, এ শিশু ভবিষ্যতে আমাদের স্থলাভিষক্ত হবে। অনেক বাদানুবাদের পর শেষ পর্যন্ত সে শিশুকে তারা নিজেদের শিশুরূপে গ্রহণ করলো এবং ধাত্রীর নিকট প্রদান করলো। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় অতি আরাম-আয়াসে ও যত্নের মধ্যে লালিত পালিত হতে লাগলেন।

এরপর হযরত খা'জা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, হে দরবেশগণ, ফেরাউনের ইচ্ছা ছিলো যে ছেলে তার দেশ ধ্বংস করার জন্য পয়দা হবে তাঁকে সে হত্যা করবে। কিন্তু সে মহান আল্লাহর হুকুম জানতো না যে, সে সন্তান তারই ঘরে তারই অর্থে ও আদর-যত্নে লালিত পালিত হবে। যখন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর বয়স চার মাস হলো তখন বিবি আছিয়া একদিন তাঁকে ফেরাউনের কোলে দিলো। ফেরাউনের দাড়ি ছিলো অত্যন্ত লম্বা। ছোটদের অভ্যাস মতো হযরত মূসা ইলাইহিস্ সালাম তার দাড়ি ধরে নাড়া-চাড়া করতে লাগলেন। ফেরাউন তাঁর হাতের পরশে ব্যথায় চিৎকার করে উঠলো এবং বললো এ ছেলে আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। এ আমার দাড়ি এতো জোরে ধরে টান মেরেছে যে ব্যথায় আমার সমস্ত শরীর কুঁকড়ে উঠছে। উত্তরে বিবি আছিয়া বললেন, এ কাজকে অন্যায়ভাবে দেখার কি কারণ আছে? এটাতো ছোট বাচ্চাদের একটা সাধারণ ও অত্যন্ত স্বাভাবিক অভ্যাস যা প্রত্যেক শিশুই করে থাকে। আচ্ছা তোমার যদি এতে সন্দেহ হয় তো আমি একটা জ্বলন্ত আগুনের টুকরো আনছি, এ যদি নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে সে অবশ্যই এ আগুনকে ক্ষতিকর মনে করে ধরবে না। আর যদি সে নেহায়েতই শিশু হয় তাহলে এ জ্বলন্ত আগুনকে সুন্দর বস্তু মনে করে ধরে খেলতে চাইবে। শেষ পর্যন্ত এভাবেই তাঁকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলো। এক টুকরো জ্বলন্ত অগ্নি তাঁর সম্মুখে রাখা হলো। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তখন আগুনে হাত রাখতে ইতস্ততঃ করছিলেন। ইত্যবসরে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে হযরত জিব্রীল

আলাইহিস্ সালাম তথায় উপস্থিত হয়ে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের হাত ধরে সেই জ্বলন্ত আঙ্গারের উপর রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিবি আছিয়া ফেরাউনকে বলে উঠলো। দেখলে এ নিতান্তই আরো দশটি শিশুর মতোই অবুঝ। সে যদি অসাধারণ কিছু হতো তাহলে অগ্নিকে ক্ষতিকর মনে করে তাতে স্বীয় হাত নিক্ষেপ করতো না। এ ঘটনা অবলোকনের পর ফেরাউন আস্বস্ত হলো। এ ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত সব সময়েই সে একটা ভীত-সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো তাঁর নিকট আগমন করতো।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের বয়স যখন পনেরর কোঠায় পৌঁছলো তখন তিনি একদিন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে রাজ্যের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ সহ বাজারে যাচ্ছিলেন। সেখানে দেখলেন, ফেরাউনের এক ভক্ত ফেরাউন নামের কসম খাচ্ছে। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন এটা কি ধরণের কসম? সে উত্তরে বললো, 'এটা আপনার পিতার নামের কসম এবং তিনিই তো আমাদের খোদা'। তিনি এ কথা শ্রবণ করার সাথে সাথে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে উঠলেন এবং তাকে এতো জোরে এক চড় বসিয়ে দিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটলো। বর্ণিত আছে যে ঐ সময় তিনি আরও কয়েকজনকে এরূপ কসম খাওয়ার জন্য প্রহার করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ফেরাউন খোদা নয়। খোদা হচ্ছেন তিনি যিনি আমাকে, তোমাকে দুনিয়া ও আসমানকে এবং বিশ্বজগৎ ও জগতের সকল বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন। এ সংবাদ যখন ফেরাউনের নিকট পৌঁছলো তখন সে বিবি আছিয়াকে ডেকে বললো, "তখন আমি বলেছিলাম না এ সন্তান আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না।" বিবি আছিয়া তাকে অনেক ভাবে বুঝিয়ে এবারের মতও শান্ত করলেন।

এরও অনেক পরের ঘটনা, সে দিনটি ছিলো ঈদের দিন। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ও ফেরাউন উভয়েই সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলো। প্রজারা দলে দলে রাজ দরবারে এসে ফেরাউনকে সেজদা করছিলো। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট এ দৃশ্য অত্যন্ত অসহ্য লাগছিলো। কেননা তিনি জানতেন যে ফেরাউনকে তারা খোদা হিসেবে সেজদা করছে এবং এ সেজদা শুধু একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই প্রাপ্য। তিনি প্রজাদেরকে সেজদা দিতে নিষেধ করছিলেন এবং ফেরাউন তার এ নিষেধের জন্য তাঁর প্রতি রাগান্বিত হচ্ছিল। বিবি আছিয়াও সে সময় দরবারে উপস্থিত ছিলো। অবস্থা চরম আকার ধরণ করার পূর্বেই সে হযরত

মূসা আলাইহিস্ সালামকে ভিতরে ডেকে নিয়ে বললো "তুমি এখন, এই মুহূর্তে এ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যাও, না হলে ফেরাউন তোমাকে মেরেই ফেলবে, আমি আর আগলাতে পারবো না। নবুয়ত লাভ করার পর পুনরায় ফিরে এসো"। বিবি আছিয়ার এ উপদেশ তিনি উপলব্ধি করতে পেরে তখনই সে শহর ত্যাগ করে অন্য শহরের দিকে চলে গেলেন। তিনি চলতে চলতে এক সময় একটি অব্যবহৃত কূপের নিকট পৌছলেন কূপটির অদূরে দু'জন যুবতী কন্যা ছাগল চরাচ্ছিলো তারা উভয়েই হযরত শোয়েব আলাইহিস্ সালামের কন্যা। ছাগলগুলোকে পানি পান করবার জন্য তারা কূপটির নিকট এসে দাড়ালো। কূপের পানি ছিলো খুবই নীচে। তাঁদের দু'জনের পক্ষে সম্ভব ছিলো না পনি উত্তোলন করা। তাঁরা কোন সাহায্যকারী পথিকদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। এমন সময় হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, মেয়ে দু'টোকে কূপের নিকট অসহয়াদের মতো দাড়ানো দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কার জন্য অপেক্ষা করছো? উত্তরে তাঁরা তাদের পানির প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করলো। তিনি তাদের জন্য তিন ডোল পানি তুলে দিলেন, তারা নিজেরা ও তাদের ছাগলগুলো পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলো।

সন্ধ্যার সময় বালিকাদ্বয় তাদের ছাগলগুলোকে যখন বাড়িতে নিয়ে এলো তখন তাদের পেটগুলো ঘাস ও পানিতে একেবারে ভর্তি ছিলো। হযরত শোয়েব আলাইহিস্ সালাম এ অবস্থা দেখে তাঁর কন্যাদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, আজ কি ছাগলগুলো পেটপূর্তি পানি পেয়েছে? ছাগলগুলোকে দেখে তো মনে হয় এদের পেট সম্পূর্ণ ভরে আছে। তাঁর মেয়েরা পিতার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, হে পিতা, আজ সন্ধ্যায় একটা লোক পেয়েছিলাম, লোকটিকে দেখে মনে হলো ভিনদেশী। তিনি একাই আমাদের জন্য তিন ডোল পানি তুলে দিয়েছিলেন। সাথে সাথে তাঁর নিকট ওহী এলো। তিনি মেয়েদেরকে বললেন, জলদি যাও তাঁকে এখানে নিয়ে এসো, তিনি অন্য কোন লোক নন তাঁর নাম হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম। হযরত শোয়েব আলাইহিস্ সালাম-এর বড় মেয়ে পিতার নির্দেশ মতো হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে ডেকে আনতে ঘর হতে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট পৌছে কিছুই বলতে পারলো না। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর আলোকিত অন্তর দ্বারা যুবতীর মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, তুমি তোমার বাড়ির দিকে একটি ইট ছুড়ে দাও তাহলে

আমি সে দিকে চলতে থাকবো এবং যখন কোন মোড় ঘুরতে হবে তখন পুনরায় আর একটি ইট সেদিকে নিক্ষেপ করলে, আমি সেদিকে চলতে থাকবো এবং তুমিও আমর পিছে পিছে চলতে পারবে। তাঁর নির্দেশ মতো যুবতি মেয়েটি তাঁদের বাড়ীর দিক লক্ষ্য করে একটি ইট ছুড়ে মারলেন। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ইটের দিক লক্ষ্য করে চলতে লাগলেন। যখনই কোন মোড় ঘুরতে হবে তখনই সে পুনরায় অন্য একটি ইট নিক্ষেপ করে তাঁদের বাড়ীর দিকে নির্দেশ করতেন। এভাবে চলতে চলতে এক সময় তাঁরা গন্তব্য স্থানে পৌছলো। হযরত শোয়েব আলাইহিস্ সালাম বাড়ির বাইরেই তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হযরত শোয়েব আলাইহিস্ সালাম হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের সঙ্গে আলিঙ্গনে মিলিত হলেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং যে মেয়েটি তাঁকে ডাকতে গিয়েছিলো তাঁর সাথে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

হযরত শায়খুল ইসলাম এরপর এরশাদ করলেন যে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম বিয়ের পরপরই নবুয়ত লাভ করলেন।

হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম তাঁর নিকট আগমন করে বললেন, হে মূসা আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ হচ্ছে তুমি ফেরাউনের নিকট যেয়ে আল্লাহ তায়ালার বাণী পৌছাও, সে যেন আল্লাহর একত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম শোয়েব আলাইহিস্ সালাম এর নিকট হতে বিদায় নিয়ে মিশরে চলে গেলেন। সেখানে মা, বোন ও ভাই হারুনের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর ফেরাউনের নিকট যেয়ে বললেন হে ফেরাউন আমি আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবী। আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর নির্দেশেই আমি তোমার নিকট এসেছি। তুমি সেই অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালার উপর এবং আমার নবুয়তের উপর বিশ্বাস স্থাপন করো পরকালের আযাব হতে মুক্তি লাভ করো; তা না হলে দুঃখ-কষ্ট তোমার উপর নাজেল হবে। ফেরাউন এ কথা শ্রবণ করে অন্দর মহেল প্রবেশ করে বিবি আছিয়াকে ডেকে বললো আজ শুধু তোমারই জন্যই আমার উপর এ বাণী নাজেল হলো। যদি আমি তাকে তখন না পালতাম তাহলে আজ সে কি করে জীবিত থাকতো আর পয়গম্বরী করতো। বিবি আছিয়া বললেন, এটাই হয়তো এলাহির ইচ্ছা ছিল। এখন এ সব চিন্তা করে লাভ নেই যা হওয়ার তাই হবে।

এরপর হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের এরশাদ করলেন যে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ফেরাউনকে অগণিত মুজেজা দেখিয়েছে কিন্তু সে দুর্ভাগা ঈমান আনে নি। কিন্তু বণি ইসরাইলদের মধ্যে হাজারো ব্যক্তি ঈমান এনে সৌভাগ্যবান হয়েছিলো। এরপর বললেন, বনি ইসরাইলগণ এক সময় সঙ্ঘবদ্ধ ও দৃঢ় হলো। আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনকে অবাঞ্ছিত মরদুদ রূপে চিহ্নিত করলেন। এরপর বললেন, আলেমগণ তফসীরের কিতাবে বর্ণনা করেছেন, যে দিন ফেরাউনকে ধ্বংস করা হবে সেদিন ১২ হাজার বনি ইসরাইল হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম এর সঙ্গে মিশর ত্যাগ করেছিলেন। ফেরাউন এ সংবাদ শ্রবণ করার সাথে সাথে ৭০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ তাদের পিছু নিলো সৈন্যদের ঘোড়া ছিল খুবই শক্তিশালী। সৈন্যদের মাথায় পাগড়ী ছিলো মনি-রত্নে সুশোভিত। প্রত্যেকটি অশ্বের গলায় স্বর্ণ নির্মিত শিকল ছিলো। মোদ্দাকথা হচ্ছে দুনিয়ার ঐশ্বর্যে জাক জমকের কোন প্রকার ত্রুটি ছিলো না। ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে সমস্ত বন জঙ্গল তোলপাড় করে তুলছিলো তারা। সে সময় বনি ইসরাইলগণ নীল নদের তীরে পৌঁছে গিয়েছিলো কিন্তু পিছনেই ফেরাউনের বিরাট সৈন্যবাহিনী দেখে ভয়ে তাদের গলা শুকিয়ে গেলো। তারা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে বললেন, হে আল্লাহর নবী ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে ধরতে পারলে একজনকেও জীবিত রাখবে না। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম এ অবস্থা দেখে দোয়া চাইলেন।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَاِلَيْكَ الْمُشْتَكٰى وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু ওয়া ইলায়কাল মুশতাকি ওয়া আনতাল মুসতাহানু ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আযীম।

হক সোবহান তায়ালা মূসা আলাইহিস্ সালাম এর উপর ওহী পাঠালেন, হে মূসা তুমি নিজের আসা নীল নদে নিক্ষেপ করো। মূসা আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালন করলেন। সাথে সাথে নদীবক্ষে ১২টি স্থানে ফাটাল

ধরলো এবং তাঁর মধ্যে ১২টি পায়ে হাটার রাস্তা তৈরী হয়ে গেলো। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম নিজের ১২০০০ অনুচরসহ ঐ পথে নদী পার হতে লাগলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ - فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ -

বনি ইসরাইলগণ যখন মাঝ দরীয়ায় পৌছেন তখন তারা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে বললো হে আল্লাহর নবী এ অবস্থায় আমাদের পিছনের ভাইয়েরা অর্থাৎ যারা বাড়ীতে রয়ে গেছে তারা মনে করবে যে আমরা নদীতে ডুবে মরে গেছি। অতএব এমন কিছু ব্যবস্থা করুন যাতে তারা আমাদের অবস্থা জানতে পারে। এ কথা শ্রবণ করে তিনি তাঁর ডানে-বামে আসা দ্বারা ইশারা করতেই রাস্তা প্রশস্ত হয়ে গেলো এবং বাইরে থেকে সবাই তাদেরকে দেখতে পেলো। বনি ইসরাইলগণ নীলনদ পার হওয়ার পর হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম চাইলেন যে ফিরে যেয়ে নদীতে পুনরায় তার লাঠি দ্বারা আঘাত করবে। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা ওহী পাঠালেন— واترك البحر رهوا - অর্থাৎ নদীকে ঐ অবস্থায়ই থাকতে দাও। বর্ণিত আছে যে ফেরাউন যখন নীলনদের তীরে তার সৈন্য সামন্তসহ পৌছলো তখনও নদীর বুক চিরে রাস্তা বিদ্যামান ছিলো কিন্তু এর পূর্বেই বনি ইসরাইলরা নদী পার হয়ে ওপারে পৌছে গিয়েছিলো। ফেরাউন নিজের সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে বললো 'দেখো নদী আমার ভয়ে চির ধরে কেমন রাস্তা করে দিয়েছে যাতে আমরা পলাতকদেরকে গ্রেফতার করতে পারি এতে তোমরা বুঝতে পারছো যে স্বয়ং— اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى - শ্রেষ্ঠ খোদা হচ্ছি আমি নিজে। এ কথা শ্রবণ করার পর তার সমস্ত দল সাথে সাথে তাকে সেজদা করলো এবং খোদা বলে স্বীকার করলো। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ওপার থেকে এ সব অবস্থা অবলোকন করছিলেন। ফেরাউন তাদের লোকজনদেরকে হুকুম দিলো নদী পার হওয়ার জন্য। আদেশ পাওয়া মাত্র তার লোকজন রওয়ানা হলো। নদীর মধ্যখানে যখন তারা পৌঁছলো তখন আল্লাহ

তায়ালার নির্দেশে নদীর পথগুলো বন্ধ হয়ে গেলো এবং নদী-তীর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো আর ফেরাউন ও তার লোকজন সব নদীতে ডুবে মারা গেলো। একটা লোকও জীবিত রইলনা। এ ঘটনা বলতে বলতে হযরত খা'জার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, হে দরবেশগণ! আল্লাহ তায়ালার শাস্তিকে সব সময় ভয় করে চলা উচিত। দেখলে আল্লাহর কহর ফেরাউনকে কিভাবে ধ্বংস করে দিলো। এমন সময় আজানের ধ্বনি ভেসে এলো। হযরত খা'জা নামাজে নিমগ্ন হলেন। মজলিস সমাপ্ত হলো।

–আল্‌হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

নবম মজলিস

শানিবার, ২৫শে জিলহজ্ব, ৬৮৯ হিঃ। প্রথমেই কদমবুসির সৌভাগ্যে ভাগ্যবান হলাম। চিশ্‌তীয়া খানদানের পাঁচজন নফর দরবেশ হযরতের খেদমতে হাজির হয়ে ছিলেন। শায়খ বাহাউদ্দিন গজনবী, মাওলানা জলালউদ্দিন, মাওলানা ইমাদউদ্দিন ও অন্যান্য প্রখ্যাত বহু সূফি দরবেশ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। হযরত এরশাদ করলেন, যেদিন হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম জন্ম নেন সেদিন তাঁর মা বিবি মরিয়ম আলাইহিস্ সালাম ইহুদীদের ভয়ে নির্জনে চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর প্রসব বেদনা শুরু হয় এবং হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম ভূমিষ্ট হন। সতী-সাধ্বী রমনী মরিয়মের নিকট তখন এমন কেউ ছিলোনা যে তাঁর এ বিপদকালীন সময়ে উপকার করতে পারতো। এমন কি সেখানে পানির উৎসও ছিলো না। বিবি মরিয়ম জমিনে পদাঘাত করায় সেখানে হতে পানির ঝর্ণার উৎপত্তি হলো। সেই পানিতে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে গোসল করিয়ে কোলে নিয়ে বসে রইলেন। হঠাৎ করে শহরে প্রচার হয়ে গেলো যে মরিয়মের ছেলে সন্তান হয়েছে কিন্তু তাঁর পিতা নেই। একদল লোক একিত্রত হয়ে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালামের নিকট গমন করে জানতে চাইলেন তাঁর পিতা কে? হযরত যাকারিয়া সে সব বিক্ষুব্ধ অবুঝদের অনেক করে বুঝালেন যে আল্লাহ্ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী, তাঁর পক্ষে বিনা পিতায় সন্তান তৈরী করা অতি সাধারণ কাজ। লোকজন তাঁর কথার এক বর্ণও বিশ্বাস করলো না। তিনি তাদেরকে বুঝাবার জন্য অযথাই চেষ্টা করলেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালামের নিকট ওহী পাঠালেন, 'হে যাকারিয়া, তুমি এদেরকে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের নিকট নিয়ে যাও সে-ই এদেরকে সন্তুষ্ট করে দিবে।' অবশেষে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম সেই ইহুদী ও নাসারাদের সঙ্গে নিয়ে বিবি মরিয়মের নিকট গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি এ সন্তান কার নিকট হতে গর্ভে ধারণ করেছিলে? বিবি মরিয়ম বললেন, তোমরা এ প্রশ্নটা বরং এ ছেলেকেই জিজ্ঞেস করো। তারা বললো এতো নবজাতক শিশু সে কি করে উত্তর দিবে? তার পক্ষে তো কথা বলাই সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে বলার জন্য নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ পেয়ে তিনি তাঁর শিশু কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ওরে

অবুঝেরা, তোমরা জেনে যাও যে আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং আল্লাহ্ তায়ালা আমার সৃষ্টিকর্তা এবং আরও জেনে যাও যে আমি তাঁর বাণীবাহক ও প্রচারক (নবী ও রাসূল)। তিনি তাঁর ক্ষমতাবলে আমাকে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছেন। তিনি অসীম ক্ষমতার অধিশ্বর।' তাঁর এ দীর্ঘ বক্তব্য শ্রবণ করার পর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ঈমান এনেছিলো।

এরপর হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের (খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি) ইরশাদ করলেন, যখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম জোয়ান (যুবক) হলেন তখন তিনি আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করতে লাগলেন। একদিন হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ শোনালেন, 'হে ঈসা, তুমি কাফেরদেরকে (অবিশ্বাসীদেরকে) ঈমান আনার জন্য আহ্বান করো।' এরপর হতেই তিনি আল্লাহ্‌র বাণী অবিশ্বাসীদের (কাফেরদের) ঘরে ঘরে পৌঁছাতে লাগলেন এবং বিভিন্ন মু'জেযা (অলৌকিকত্ব) দেখাতে লাগলেন। কিন্তু সেই সব সীলকরা পাথর-হৃদয় সম্পন্ন ইহুদীগণ তাঁর কথায় ঈমান আনলো না। যারা আনলো তাঁদের সংখ্যা নগণ্য। তারা ঈমান তো আনলোই না বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো এবং তাঁর মু'জেযা দেখে বলতো খুব ভালো যাদু শিখেছো। যাদুর জগতে তোমার উপমা বিরল। বর্ণিত আছে যে একবার কাফেরগণ একত্রিত হয়ে বললো, যদি তুমি কোন মৃতকে জীবিত করতে পার তাহলে ঈমান আনবো। হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালাম তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বললেন, "মু'জেযা আপনাকে দান করা হয়েছে, আপনি পথভ্রষ্টদেরকে তা দেখাতে পারেন।" হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এ ওহী পাওয়ার পর তাদেরকে বললেন, "মৃতকে উপস্থিত করো।" তারা তৎক্ষণাৎ একটা মৃতদেহ নিয়ে এলো। ঈসা আলাইহিস সালাম দু'রাকাত শোকরানা নামায আদায় করলেন এবং মাথা সেজদাবনত করে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত হওয়ার জন্য দোয়া চাইলেন। তাঁর মস্তক উত্তোলন করার পূর্বেই মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে বলে উঠলো, "লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা রাসূলুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী। যাদের ভাগ্যে বিশ্বাসী হওয়ার যোগ্যতা ছিলো তারা ঈমান আনলো এবং অবশিষ্টরা এ মু'জেযাকে যাদু বলে আখ্যায়িত করে বেঈমান অর্থাৎ অবিশ্বাসী রয়ে গেলো।

সব শেষে কাফেরগণ যখন একত্র ও সংঘবদ্ধ হয়ে তাঁকে মারার জন্য ফন্দি আট্‌লো তখন হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালাম অবতরণ করে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে চতুর্থ আসমানে তুলে নিলেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা সেখানেই তাঁকে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। দুনিয়ার মতো সর্ব প্রকার আয়াশ আরাম ভোগ করার অধিকার সেখানে তাঁর রয়েছে।

এরপর তিনি হযরত খিজির আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করতে যেয়ে বললেন যে তাঁকে অমরত্ব দান করা হয়েছে। তাঁকে অমরত্ব দানের পিছনে রয়েছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের উম্মতের মধ্যে যারা অলি হবেন তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতা ও যোগাযোগ রক্ষা করা। তিনি প্রথম হতে যে সব নবী রাসূল ও পয়গম্বরদেরকে দেখছেন, শুনেছেন তাঁদের সম্বন্ধে অলিদের জ্ঞান দান করা ও তখনকার অবস্থা বর্ণনা করা। এ ছাড়াও তাঁর দায়িত্ব রয়েছে সমস্ত পানি ও পানি পথের উপর। তিনি নদীপথে ভুলে যাওয়া পথিকদেরকে পথ দেখান ও ডুবন্ত লোকদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ্ বাঁচাবার ইচ্ছা করেন তাদেরকে উদ্ধার করেন এবং এ সব বিভিন্ন কারণেই তাঁকে কেয়ামত পর্যন্ত হায়াত দান করা হয়েছে। এ ঘটনা বলতে বলতে আযানের ধ্বনি ভেসে এলো। তিনি উঠে যেয়ে নামাযে নিমগ্ন হলেন। মজলিস বরখাস্ত হলো।

–আল্‌হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

দশম মজলিস

শুক্রবার, দ্বাদশ জিলহজ্ব, ৬৮৯ হিঃ। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ হলো। মাওলানা ফখরুদ্দীন যারাদী, মাওলানা শামস্‌উদ্দিন এহ্‌ইয়া, মাওলানা শিহাবউদ্দিন এবং অনেক সূফি দরবেশ খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। হযরত বললেন, হযরত লুৎ আলাইহিস সালাম অত্যন্ত খোদাভীরু পয়গম্বর ছিলেন। সব সময়েই আল্লাহ্‌ তায়ালার বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। কখনও আল্লাহ্‌ তায়ালার ধ্যান হতে বিরত থাকতেন না। কিন্তু যখন তাঁর উম্মতগণ অপকর্মে জড়িত হতে লাগলো তখন তিনি অনেক করে তাদেরকে বোঝালেন কিন্তু তারা সংশোধন হলো না। এ সম্বন্ধে আম্বিয়াদের কাসাস (গল্প) গ্রন্থে লিখিত আছে- عَرَائِسُ الشَّيْجَان - যে তাঁর উম্মতদের চরিত্রের মধ্যে যখন নিম্নোক্ত বদ অভ্যাসগুলো প্রবেশ করেছিলো তখন আল্লাহ্‌ তায়ালা আসমান হতে এক ভয়ানক শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলো এবং মাটিকে নির্দেশ দিলো সেই সব দুশ্চরিত্র ও পথভ্রষ্টদেরকে গ্রাস করে নিতে।

বদ্‌ অভ্যাসগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. মদ্যপান করা।

২. সম মৈথুন ও ব্যভিচার করা।

৩. রঙ্গীন ও লাল কাপড় পরিধান করা।

৩. লেংটী বা খাটো কাপড় পরিধান করা।

৫. যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য কামান তৈরি করা।

৬. কবুতর বাজী করা।

৭. অন্য কারও গীবত (পরচর্চা) করা।

৮. ভবঘুরের মতো বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ানো।

৯. একে অপরের লজ্জাস্থান দর্শন করা।

১০. অন্যকে লুৎ আলাইহিস সালামের মতো মনে করা।

এ ঘটনা বলতে বলতে হযরত খাজা যিকরুল্লাহ্‌ বিল খায়ের-এর চোখে অশ্রুকণা দেখা দিলো এবং তিনি বললেন, হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন মাসুদ

রহমতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত আছে যে হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে বর্ণিত ঐ সব বদখাছলত ছাড়াও আমার উম্মতের মধ্যে আরও একটি বদস্বভাব দেখা দিবে তা হচ্ছে স্ত্রীলোক স্ত্রীলোক দ্বারা যৌনক্ষুধা নিবৃত্তি করবে। এরপর বললেন তফসীরের কিতাবে বর্ণিত আছে যে যখন উম্মতে মুহাম্মদীন-এর মধ্যে ঐ সব বদ অভ্যাসগুলো বিস্তার লাভ করবে তখন আকাশ হতে পাথর বর্ষিত হবে, অসুস্থতা বেড়ে যাবে নতুন নতুন রোগ দেখা দিবে এবং জগতে ফ্যাসাদ বৃদ্ধি পাবে। হযরতের বর্ণনা যখন, এ পর্যন্ত পৌঁছলো তখন আযানের ধ্বনি ভেসে এলো। খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের নামাযে নিমগ্ন হলেন। অন্যান্যরাও তখন মজলিস ত্যাগ করলেন। ঐ দিনের মতো মজলিস সমাপ্ত হলো।

–আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

একাদশ মজলিস

বৃহস্পতিবার, ৯ই সফর, ৬৯০ হিঃ। কদমবুসির আশীষ লাভ করলাম। মাওলানা বোরহানউদ্দিন গরীব, মাওলানা শামস্উদ্দিন এহ্ইয়া ও অন্যান্য সূফি-দরবেশ খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা চলছিলো সফর মাস সম্বন্ধে। হযরত বললেন, সফর মাস হচ্ছে দুঃখদানকারী মাস। বনি আদমদের প্রতি যে সব বালা নাজিল হয় তার অধিকাংশই হয় এ সফর মাসে। আমি প্রাচীনকালের কিতাবে দেখেছি যে, এ মাসে ১২৪ হাজার বালা নাজিল হয়। সুতরাং সকলেরই উচিত এ মাসে আল্লাহ্র প্রতি নিবিষ্ট থাকা যাতে ঈমান ও আমান আল্লাহ্ তায়ালাতে বিলীন থাকে। এরপর বললেন, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ بَشَّرَنِىْ بِخُرُوْجِ الصَّفَرِ بَشَّرْتَهُ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে সফর মাস শেষ হওয়ার সুসংবাদ দিবে আমি তাকে বেহেস্তে প্রবেশের সুসংবাদ দিব। হযরত খাজা এরপর বললেন যে, হযরত রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সফর মাসেই অসুস্থ হয়েছিলেন এবং সে অসুস্থতায় তিনি দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যান।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো 'সুলুক' সম্বন্ধে হযরত ইরশাদ করলেন, খাজেগানে চিশ্ত রাহমাহুমুল্লাহ আলাইহি সুলুককে ১৫টি স্তরে বিভক্ত করেছেন। এর পঞ্চম স্তর হচ্ছে কাশ্ফ ও কারামত, শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা পঞ্চম স্তরে নিজেদেরকে প্রকাশ করবে তারা অবশিষ্ট স্তরগুলো আর অতিক্রম করতে পারবে না। অতএব শিক্ষার্থীদের উচিত পঞ্চম স্তরে আত্মপ্রকাশ না করা। প্রকাশ করলে পথভ্রষ্ট হবে। এরপর ইরশাদ করলেন যে, শায়খুল আলম শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি ও শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া এক সঙ্গে ভ্রমণে রত ছিলেন, পথ চলতে চলতে তাঁরা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি নদীর কিনারে পৌছলেন। স্থানটি ছিলো অত্যন্ত বিপদ শঙ্কুল। আশে-পাশে তাঁরা কোন নৌকা বা অন্য কোন যানবাহন দেখতে পেলেন না অথচ সেখানে অপেক্ষা করাও

নিরাপদ ছিলো না। নিরুপায় হয়ে হযরত খাজা শায়খ ফরিদউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় পা নদীতে রাখলেন এবং হেঁটে নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেলেন। এ দৃশ্য দেখে শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া চিন্তিত ও হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তাঁর মনের অবস্থা হযরত খাজা বুঝতে পেরে বললেন এ কাজ কাশ্‌ফ ও কারামতের সৌজন্যে সম্পন্ন হয়েছে। যেহেতু এখানে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে সেহেতু কারামতের সাহায্য গ্রহণ করা বা তা প্রয়োগ করা অন্যায় নয়। অবশ্য বিনা প্রয়োজনে লোক দেখানোর জন্য কাশ্‌ফ ও কারামত প্রদর্শন করা অন্যায় ও নিজের জন্য ক্ষতিকর। এ কথা শ্রবণ করে হযরত যাকারিয়া তৃপ্ত হলেন এবং স্বীয় পা পানিতে রেখে হেঁটে নদী পার হয়ে হযরত শায়খ ফরিদ রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকটে পৌঁছলেন।

হযরত খাজা নিজামউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, কাশ্‌ফ ও কারামত দ্বারা নেকী ও বদী (পাপ ও পূণ্য) উভয়ই অর্জন করা যায়। বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কাশ্‌ফ-কারামতের প্রয়োগ পূণ্য আনয়ন করে। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে আসে পাপ। হযরত শায়খ যে ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার করেছেন সে ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে পূণ্যের কাজ হয়েছে। কেননা জান বাঁচানো ফরজ। অতএব এ ক্ষেত্রে তিনি কারামত ব্যবহার করেছেন ফরজের জন্য।

পরবর্তী আলোচনা হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালামকে নিয়ে শুরু হলো। হযরত এরশাদ করলেন যে একবার হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আপনার দেহের পছিনা (ঘাম) সাদা কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহ্ পাক আমাকে কাফূর (কর্পূর) দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আমি আমার জন্ম নিয়ে একদিন চিন্তা করছিলাম। সে দিনই বারিতায়ালা আমাকে আদেশ করলেন, 'যাও আমার হাবীব আখেরী জমানার নবীকে জাগ্রত করে এখানে নিয়ে আস।' নির্দেশ মতো আমি সে স্থানে গেলাম। তিনি নিদ্রিত ছিলেন। তিনি যে আল্লাহ্ তায়ালার হাবীব (বন্ধু) তাঁর প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, তাঁকে যে সম্মানের সঙ্গে জাগ্রত করতে হবে, এ সব কিছুই আমার মনে হলো না। আমি যেয়ে তাঁর পবিত্র কেশ গুচ্ছের উপর দাঁড়ালাম, সাথে সাথে আল্লাহ্ পাকের রূঢ় নির্দেশ এলো 'হে নাদান! আমার প্রিয় হাবীবের পায়ের তালুতে বুসা (চুম্বন) দাও।' সঙ্গে সঙ্গে আমি অতি সম্মানের সাথে তাঁর সম্পূর্ণ পবিত্র পদতলে চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিলাম। তিনি আস্তে আস্তে জাগ্রত হলেন। তারপর আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ হলো, 'হে জিব্রীল আমি তোমাকে ছয় লাখ বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সৃষ্টি করেছি কর্পূর দ্বারা, এ জন্য যে আজ তুমি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদতলে চুম্বন দিবে এবং কর্পূরের শীতল পরশে তিনি জাগ্রত হবেন।' হযরত খাজা এরপর বললেন যে, এ ঘটনা হতেই আমরা জানতে পারি হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালাম কর্পূর দ্বারা সৃষ্ট।

পরবর্তী আলোচনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা নিয়ে শুরু হলো। হযরত খাজা বললেন, হযরত রাসূলে পানাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম হতে বর্ণিত আছে যে, "শবে মিরাজে আমি একজন ফেরেস্তাকে দেখলাম তাঁর ৫০০ শত মুখ এবং প্রত্যেকটি মুখের জিহ্বা আছে আর প্রত্যেকটি জিহ্বা দ্বারাই আমার প্রতি দরূদ পাঠ করছিলো। তিনি এরপর বললেন, যারা ফুলের ঘ্রাণ নেয় তাদের উচিত আমার প্রতি দরূদ পাঠ করা। আল্লাহ্ তায়ালা দরূদ পাঠকারীকে অগণিত পূণ্যদান করেন। এরপর বললেন, যে ব্যক্তি মদের মধ্যে ফুল ফেলে তারপর তা পান করে, তাদের ঈমান চলে যায়। কেননা ফুলে রয়েছে একটি সুগন্ধি উপাদান এবং সে উপাদান তারা লাভ করেছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম হতে। অতএব এ ব্যাপারে ভয় রাখবে। যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পাঠ করেছে সে শরাবের মহত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে এবং তা জানার পর তা পান করতে থাকলে ঈমান নষ্ট হতে থাকে। এ সময়ে মজলিসে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললেন, হযরত ইউনুছ আলাইহিস সালাম এর দেহ মাছের পেটে থাকা সম্বন্ধে কিছু ঘটনা জানতে বাসনা রাখি। হযরত খাজা ইরশাদ করলেন, হযরত ইউনুছ আলাইহিস সালাম এর উপর ইশ্‌ক ও মুহাব্বাতের অগ্নি প্রভাব বিস্তার করেছিলো, সে অগ্নি নির্বাপিত করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিলো পানিতে নির্বাসিত করা। আর সে পানিতে বাস করার জন্যই তাঁকে আল্লাহ্ তায়ালা পাঠিয়েছিলেন মাছের পেটে।

হযরত খাজা যখন এ ঘটনা বর্ণনা করছিলেন তখন আযান আরম্ভ হলো। হযরত খাজা নামাযে নিমগ্ন হলেন মজলিস আপাততঃ শেষ হলো।

–আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

দ্বাদশ মজলিস

শনিবার, ১লা রবিউল আউয়াল, ৬৯০ হিঃ। কদমবুসির দৌলত হাসিল হলো। মজলিস শরীফে মাওলানা এমাদউদ্দিন মুজাফফর, মাওলানা শামসুদ্দীন এহ্ইয়া, মাওলানা বুরহানউদ্দিন গরীব ও খানকার অন্যান্য খাদেম উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় কয়েকজন দরবেশ ভ্রমণ হতে এসে উপস্থিত হলেন। আলোচনা চলছিল আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সঙ্গীগণ (আসহাব রাদিআল্লাহু আনহুম) সম্বন্ধে। খাজা যিকরুল্লাহ্ বিল খায়ের ইরশাদ করলেন যে রাত্রে তিনি ভুমিষ্ঠ হলেন সে রাতে তাঁর চাচা আবু তালিব স্বপ্নে দেখলেন যে আসমান হতে একটা সূর্য তাঁদের ঘরে প্রবেশ করলো এবং কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিজেদের চেরাগ সেই সূর্য হতে জ্বালিয়ে নিচ্ছিল এবং পরে প্রকাশ্যে প্রকাশ হচ্ছিলো। হযরত খাজা বললেন, ঐ সূর্য হতে চেরাগ জ্বালানোর অর্থ হচ্ছে ঈমান আনা। বর্ণিত আছে যে তাঁর দুনিয়ায় আগমনের সময় তাঁর মা ঘরে একাকী ছিলেন। চেরাগও ছিল নির্বাপিত। হঠাৎ সমস্ত ঘর আলোকিত হয়ে উঠলো। আসমান ও জমীনের সমস্ত ফেরেস্তা মাথা সেজদাবনত করে বলতে লাগলো সমস্ত আলমের (জগতের) রহমত দুনিয়ায় আবির্ভাব হলো। ঐ সময় মূর্তিগুলোর মস্তক অবনত হয়ে পড়লো। এ ঘটনা যখন তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের কর্ণগোচর হলো তখন স্বপ্ন হতে জেগে আবদুল্লাহ্র দরজায় এসে দরজা ধাক্কা দিলেন। দরজা খুলে গেলো। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন জনাব রেসালতে পানাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তিনি নিজের কোলে তুলে নিলেন এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম এর পেশানী (কপাল) মোবারকে চুমু খেয়ে বললেন এ হচ্ছে আখেরী জমানার নবী যাঁর বর্ণনা ইঞ্জিলে রয়েছে এবং এর গুণ ও প্রশংসা আসমানী কিতাবগুলোতেও বিদ্যমান। এ সময়ে আবু তালিবও এলেন এবং অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়ে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। মস্তক ও পেশানী মোবারকে চুমু খেয়ে হযরত আবদুল মুত্তালিবের নিকট আরজ করলেন আমার কোন সন্তান নেই যদি অনুমতি পাই তো একে নিজের সন্তান রূপে গ্রহণ করি। হযরতের সকল আত্মীয়-স্বজন তাঁর ইচ্ছার প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তাঁর দুই কাঁধের মাঝে নূরের অক্ষরে এ কথা লিখাছিলো–

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসূলুহু। এবং তাঁর স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে মোহরে নবুয়ত (নবুয়তের সীল) প্রোজ্জ্বল ছিলো। এক রাবী বর্ণনা করেছেন, সে রাতে এ দৃশ্য দেখে বহু শত ইহুদীর অন্তরে তাঁর প্রতি ঈমান সৃষ্টি হয়েছিলো। এরপর হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের এরশাদ করলেন, যে ঘরে হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম পয়দা হয়েছিলেন সেটা আজও অম্লান রয়েছে। যে ব্যক্তি সে ঘরে দাখেল হয় তার শরীর হতে আতরের সুবাস ছড়াতে থাকে এবং তার কাপড়েও থাকে সাতদিন পর্যন্ত সেই আতরের গন্ধ। এরপর যিকরুল্লাহ বিল খায়ের বললেন, হে দরবেশগণ! সূর্য ও চন্দ্রকে যে নূর দান করা হয়েছে তা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালাম এর নূর হতে। এরপর বললেন, হে দরবেশগণ, দুনিয়ার যত কিছু আছে সে সমস্ত কিছুর মধ্যেই হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালাম ও আল্লাহ্র পবিত্র নাম সুপ্তাকারে বিরাজিত আছে এবং তাদের প্রত্যেকের প্রতি নির্দেশ রয়েছে জীবিত কাল পর্যন্ত তারা তাঁদের পবিত্র নামের জেকের করতে থাকবে। আসমান ও জমীনের এমন কোন স্থান নেই যেখানে তাঁদের পবিত্র নামের মহিমা বিরাজিত নেই। পুনরায় বললেন, হে দরবেশগণ, যখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু তালিবের সঙ্গে ভ্রমণে যেতেন তখন হক তায়ালা (আল্লাহ্ তায়ালা) মেঘকে হুকুম করতেন রৌদ্র তাপ হতে তাঁকে মুক্ত রাখবে, সব সময় তাঁকে ছায়া দ্বারা ঢেকে রাখবে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালাম এর মুজেযার মধ্যে একটা জিনিস ছিলো যে তিনি সম্মুখে যতটা স্থান দেখতে পেতেন পিছনেও ততটা জায়গা দেখতে পেতেন এবং স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থায় একই ভাবে দেখতে পেতেন ও শুনতে পেতেন। তাঁর শান (মর্যাদা) এত অধিক ছিলো যে আল্লাহ্ তায়ালা কসম করে বলেছেন, "যদি আমি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে আসমান জমিন ও আসমান জমিনের মধ্যস্থিত কোন বস্তুই সৃষ্টি করতাম না।"

এরপর বললেন, হে দরবেশগণ, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাই করবেন যা তাঁর হাবিব বলবেন। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন এবং মুহাব্বতের নিয়মও তাই। এ কর্ম প্রেমের আধিক্যের কারণেই ঘটবে। এরপর বললেন, যে দিন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহে মুর্দাকে (মৃতকে) জিন্দাহ (জীবিত) করেছিলেন, সেদিন তাঁর প্রতি আল্লাহ্পাকের নির্দেশ ছিল মুর্দার উপর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম নিয়ে 'ফু' দিতে। আল্লাহ তায়ালা তার পরম বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের বরকতে সেই মুর্দাকে জিন্দা করেছিলেন। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে অবস্থানকালে একদিন হযরত ওসমান বিন্ আফফান রাদিআল্লাহু আনহু বাজার হতে একটি মাছ এনে ভাজার উপযোগী করে গরম তেলে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু মাছটির স্বাভাবিক অবস্থার কোনই পরিবর্তন হলো না, রন্ধনশালায় বহু লাকড়ী সে মাছটি ভাজার জন্য ব্যয় করা হলো কিন্তু কোন লাভ হলো না। এমন উত্তপ্ত তেলে থাকার পরও মাছটির সামান্যতম ক্ষতিও হলো না। এ ঘটনা তখন বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করলো এবং শেষ পর্যন্ত ঘটনাটি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট পেশ করা হলো। তিনি মাছটিকে তাঁর সম্মুখে হাজির করতে নির্দেশ দিলেন। মাছটিকে তাঁর নিকট হাজির করা হলো। তিনি মাছটিকে প্রশ্ন করলেন, হে মাছ তোমার মধ্যে এমন কি কামালিয়াত আছে যার জন্য তোমাকে ভাজা যাচ্ছে না এবং আগুনও তোমার কোন ক্ষতিসাধন করতে পারছে না? হক সোবহান তায়ালা মাছকে বলার ক্ষমতা দিলেন। মাছ বলতে লাগলো, "ইয়া রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি নদীতে থাকা কালে একদল লোককে দেখেছিলাম আপনার প্রদি দরূদ পাঠ করতে, আমি তখন শুনে শুনে দরূদটি শিখেছিলাম এবং আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করতাম। আল্লাহ্ পাক সেই দরূদ শরীফের বরকতে আগুনকে আমার প্রতি হারাম করে দিয়েছেন।" এ ঘটনা বর্ণনা করে হযরত খা'জা যিকরুল্লাহ্ বিল খায়ের হায় হায় করে কেঁদে উঠলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "ইলাহি, যে তোমার হাবীবের প্রতি দরূদ পাঠিয়েছে তার জন্য তুমি আগুনকে হারাম করেছো। আর যারা প্রায়ই দিনে রাতে তোমার হাবীবের উপর দরূদ পাঠ করে তারা কেন দোজখের আগুন হতে পরিত্রাণ পাবে না? এরপর এরশাদ করলেন, হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম একদিন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আরজ করলন ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি আপনার ও আপনার আওলাদের খেদমত করি, আমার বাসনা হচ্ছে কিয়ামতের দিন আপনি আমার জন্য সুপারিশ করবেন এবং সেদিন আমাকে যেন বিস্মৃত না হন।

এরপর বললেন একদিন হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ফেরেস্তাগণ আসমানে কি কাজ করেন? উত্তরে হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম বললেন, হে দাউদ আলাইহিস্ সালাম, যখন তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তখন হতেই আল্লাহপাকের হুকুম, অহরাত্র বিরতিহীনভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি

দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকো, তা না হলে তোমাদের নাম ফেরেস্তাদের তালিকা হতে বাদ দেয়া হবে। এরপর এরশাদ করলেন যখন আল্লাহ্ পাক হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের তওবা কবুল করতে সম্মত হলেন তখন তিনি হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামকে বললেন, 'হে দাউদ, আমার দরবারে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর নাম ইজ্জতের সঙ্গে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে লও তো তোমার তওবা কবুল হবো'। এরপর এরশাদ করলেন যে, এসব ঘটনা বিশ্লেষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আসমান জমিন ও এর মধ্যস্থিত সকল কিছু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর তোফায়েলেই সৃষ্টি হয়েছে এবং তিনি সমস্ত কিছুর মধ্যেই সুপ্ত আছেন।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো আমিরুল মুমেনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু সম্বন্ধে। খা'জা যিকরুল্লাহ্ বিল খায়ের বললেন, পুরুষদের মাঝে সকলের আগে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু মুসলমান হয়েছিলেন। অর্থাৎ ঈমান এনে ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি ছিলো এরূপ-আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়ত গ্রহণের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু যখন ব্যবসা-সংক্রান্ত সফর শেষে ফিরে এলেন তখন রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ইসলাম গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে বললেন, তুমি আমার নবুয়তকে স্বীকার করে নাও এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আন, তিনি শুনামাত্রই বলে উঠলেন صَدَّقْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (সাদ্দাকতা ইয়া রাসূলাল্লাহ) অর্থ-হে আল্লাহর রাসূল আপনি সত্য বলেছেন। আমি পবিত্র অন্তকরণে সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয় এবং তার কোন শরীক নেই।

এরপর হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদিআল্লাহু আনহুর বুজুর্গী সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বললেন, পথ চলতে একদিন একটা কীট তাঁর পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে এমন জোরে চিৎকার করে উঠলো যে তিনি ব্যপারটি অনুধাবন করতে পারলেন। সাথে সাথে পাটা তুলে দেখলেন যে কীটটি মরে গেছে। মৃত কীটটিকে তিনি হাতে তুলে নিলেন এবং স্বীয় মুখ আকাশের দিকে নিবদ্ধ করে বললেন, ইয়া ইলাহি যদি তোমার দরবারে আমার কোন প্রকার ইজ্জত থেকে থাকে তাহলে এ মৃত কীটটিকে পুনরায় জীবন দান করো। তিনি বোধ হয় তাঁর বাক্যটি শেষও করতে পারেন নি তার পূর্বেই কীটটি জীবন ফিরে পেলো।

হযরত খাজা পরবর্তী ঘটনাও হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন, বললেন একবার হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদিআল্লাহু আনহু নিজের দাড়ী মোবারক চিরুনি করছিলেন। এমন সময় একটা দাড়ী ছিড়ে গেলো। তখন খুব জোরে বাতাস বইছিলো এবং সে বাতাসে তাঁর সেই পবিত্র দাড়িটি উড়ে যেয়ে এক ইহুদী কবরস্থানে পতিত হলো। ঐ দাড়ীর বরকতে সে কবরস্থানে তিন দিন পর্যন্ত কবর আযাব বন্ধ ছিলো।

এরপর বললেন, আমিরুল মোমেনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু যখন নম্রতা خُشُوْع (খুশু') ও বিনয়াবতার خُضُوْع (খুজু') নামাজে দন্ডায়মান হতেন তখন ৭০ হাজার ফেরেস্তা সহচর তাঁকে দেখার জন্য উপস্থিত হতো। তিনি যখন তকবীর বলতেন তখন সকলের ধমনীতে কম্পন আরম্ভ হয়ে যেতো। তিনি নামাজ শেষ করে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আস্তানা মোবারকে উপস্থিত হতেন। তখনও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরজা বন্ধ থাকতো। তিনি দরজা না খোলা পর্যন্ত চৌকাঠের সঙ্গে সেঁটে থাকতেন। যখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর হতে বেরুতেন তখন তিনি হযরত আবুবকর রাদিআল্লাহু আনহুকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলতেন, হে আবুবকর, এতো সকাল সকাল কেন আস? তিনি জবাব দিতেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি সকালে এ জন্য আসি যে সকালে আপনার দর্শন লাভকারী ব্যক্তিদের মধ্যে আমি প্রথম ব্যক্তি হবো। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, খোদার ইচ্ছায় আবু বকরের দাড়ীর রৌশনী হেজাবে আজমত হতে তাহতে আছরা পর্যন্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে।

খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের এরপর বললেন, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিয়ম ছিলো রমজান মাসের প্রত্যেক রজনীতে নিজের চার সহচর ও হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুমদেরকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে চলে যেতেন এবং উম্মতের গোনাহ মাফের জন্য দোয়া করতেন। সর্বশেষ রজনীতে হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম অবতরণ করে বলতেন হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা উত্তোলন করুন, আল্লাহ পাক বলেছেন, "আমি আবুবকরের প্রত্যেক শুভ্র দাড়ীর বিনিময়ে তোমার হাজার হাজার গোনাহগার উম্মতদেরকে ক্ষমা করে দিবো এবং দোজখ হতে মুক্তি দিবো"। এরপর বললেন এমনিভাবে যখনই তিনি এরূপ মোনাজাত করতেন তখনই আওয়াজ আসতো আমি হযরত আবুবকর রাদিআল্লাহু আনহুর এক একটি দাড়ীর জন্য তোমার হাজার হাজার উম্মতকে ক্ষমা করে দিবো এবং দোজখ হতে নাজাত দিব।

এরপর এরশাদ করলেন, একদিন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহার হুজরায় অবস্থান করছিলেন। তিনি হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহুর বুজুর্গী সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বললেন যে, হে আয়েশা, আজ তোমাকে তোমার পিতা আবুবকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহুর বুজুর্গী সম্বন্ধে কিছু বলছি। তাঁর নাম সূর্যের অভ্যন্তরে ক্ষুদিত আছে। সূর্য যখন দুপুরে খানা কাবার উপরে এক সরল রেখায় দন্ডায়মান হয় তখন সে বলে এ স্থান অতি শ্রেষ্ঠ স্থান। এ স্থান অতিক্রম করতে ইচ্ছে হয় না। সে যখন এমন ভাবে আচ্ছন্ন হয় তখন তার উপর নির্ধারিত ফেরেস্তা তাকে তোমার পিতার নামের কসম দিয়ে বলে তোমার অভ্যন্তরে যে নাম লিখিত আছে সে নামের সম্মানে তুমি এ স্থান ত্যাগ করো। এ কসম দেয়ার সাথে সাথে সূর্য ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করে।

এরপর বললেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু-কে হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদিআল্লাহু আনহুর বুজুর্গী সম্বন্ধে কিছু বলতে বলা হয়েছিলো। তিনি বললেন আমার এমন ক্ষমতা নেই যে তাঁর বুজুর্গী সম্বন্ধে কিছু বলবো। আমি কয়েক বছর মোনাজাতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজ করেছি 'আমি যদি অন্তত হযরত আবুবকরের সিনার একটা পশমের সমতুল্যও হতে পারতাম তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। কেননা তাঁর এক একটি লোমের বিনিময়ে হাজার হাজার পাপী উম্মত নাজাত পাবে।'

পরবর্তী আলোচনা শুরু হলো হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু সম্বন্ধে। খাজা যিকরুল্লাহি বিল খায়ের বললেন তাঁর মুসলমান হওয়ার ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

একদিন তিনি মক্কা মোয়াজ্জমার ইহুদীদেরকে একত্রিত পেয়ে বললেন, যদি আমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জীবিত গ্রেফতার করে আনতে পারি তা হলে আমাকে তোমরা কি দিবে? তাঁরা নিজেরা কিছুক্ষণ পরামর্শ করে বললো, আমরা তোমাকে আমাদের বাদশা বলবো এবং মক্কার শাসন ক্ষমতা বংশানুক্রমে তোমর বংশধরেরা ভোগ করবে এবং সে নিয়ম চিরদিন কায়েম থাকবে। এ প্রতিশ্রুতি লাভ করার পর সে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে অত্যন্ত ক্ষিপ্তভাবে তীব্র গতিতে পথ চলছিলেন, পথ চলতে চলতে হঠাৎ কোরআন শরীফ পাঠের আওয়াজ তাঁর কানে ভেসে এলো। তাঁর বোন

পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তিনি তা জানতেন না। বোন কোরআন শরীফের তোয়া-হা সূরা পাঠ করছিলেন যা ঐ দিনই নাজিল হয়েছিলো। তিনি ঘোড়া হতে অবতরণ করে বোনের দরজায় কান লাগিয়ে অতি মনযোগ সহকারে পবিত্র কালামের বাক্য শ্রবণ করছিলেন এবং নবীজীকে গ্রেফতারের পরিকল্পনা তার নিঃশেষ হচ্ছিলো। পবিত্র কালামের (বাণীর) আওয়াজ ও তার কথা তাঁকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করালো। তিনি এক অনাবিল শান্তিতে যেন মোহবিষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি আওয়াজ দিয়ে দরজা উন্মুক্ত করতে অনুরোধ জানালেন। বোন, ভাইয়ের আওয়াজ পেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কোরআন শরীফের অংশটুকু লুকিয়ে রেখে এসে দরজা খুলে দিলেন। হযরত ওমর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর বোনকে বললেন, 'সত্য করে বলতো তুই কি পাঠ করছিলি?' বোন, ভাইয়ের ভয়ে তাঁর কোরআন শরীফ পাঠের ব্যাপারটি প্রথমে অস্বীকার করলেন। কিন্তু যখন হযরত ওমর রাদি আল্লাহু আনহু কোমর হতে তলোয়ার বের করে বললেন যদি সত্য কথা না বলিস তাহলে আজ আমি তোর প্রাণ নাশ করে দিবো। তখন তাঁর বোন নিরুপায় হয়ে বললেন, আমি সেই পবিত্র কালাম পাঠ করছিলাম যা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালাম এর উপর নাজিল হয়েছে। তিনি তখন বললেন, হে ভগ্নি তুই আমাকে কোরআনের ঐ অংশটুকু দে আমি পড়বো। কেননা ঐ বাণী একবার শোনার পর আমার শরীর ও মনে শীতলতার আবেশে কম্পন শুরু হয়ে গেছে। ওটা না পড়লে আর আমার ভাল লাগছে না। তিনি বললেন হে ভ্রাতা তুমি এখনও মুসলমান হও নি। তোমার দেহমনে অপবিত্রতা ছেয়ে আছে। যে পর্যন্ত তুমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর রেসালতকে স্বীকার না করবে এবং আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় না জানবে সে পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই এ পবিত্র কালাম লাভ করতে পারবে না। তিনি এ কথা শুনামাত্র তাঁর বোনকে বললেন, তুই আমাকে সেই মহীয়ানের খেদমতে নিয়ে চল আমি ঈমান আনবো। তাঁর বোন বললেন, এ অবস্থায় তুমি সেখানে যেতে পারবে না। সেখানে বিনয়াবনতা ও নম্রতা সহকারে যেতে হয়। যেহেতু তাঁর তখন ইসলাম গ্রহণ করার সময় হয়েছিলো সেহেতু তিনি বললেন, যেভাবে সেখানে যেতে হয় সেভাবেই আমাকে প্রস্তুত করে নিয়ে চল এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে আমার জন্য আরজ করবি, "বিভ্রান্ত বান্দা শুদ্ধিকরণের দরবারে উপস্থিত, সে আশা করছে আপনার করুণা ও দয়া দ্বারা তাকে খেদমতে কবুল করুন"। তাঁর বোন তাঁর

কথা রক্ষা করেছিলেন এবং যেভাবে তিনি বলতে বলেছিলেন সেভাবেই তিনি বলেছিলেন। এঘটনা ঘটার পূর্বেই হযরর জিব্রীল আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ তায়ালার বাণী পেশ করলেন, হে মুহাম্মদ, ওমরকে আমি আমার বন্ধুত্বে কবুল করেছি, আপনি তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলুন। ইত্যবসরে হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর বোনের সঙ্গে দরবারে উপস্থিত হলেন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ইসলাম কবুল করতে বললেন এবং তিনিও পবিত্র অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন।

হযরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পর প্রকাশ্যে আযান দেয়ার রীতি প্রচলিত হলো এবং পূর্বে আযান অপ্রকাশ্যে দেয়া হতো। তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি হলো।

হযরত আবু লাইছ বিরচিত ফেকার কিতাব তম্বীতে লিখিত আছে যে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন যদি আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করে যে তুমি আমার জন্য কি তোহ্‌ফা (উপহার) এনেছো? উত্তরে আমি বলবো, "আপনার জন্য হযরত ওমরকে এনেছি।"

হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহ আনহু অত্যন্ত দৃষ্টিসম্পন্ন মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর ন্যায়পরায়ণতার কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে। তিনি তাঁর আপন ছেলে আবু শাহমাকে শরীয়তের কঠিন বিধান মতে শাস্তি দান করেছিলেন। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী জেনা করার অপরাধে নিজ হাতে তাঁর ছেলেকে তিনি দুররার (চাবুকের) ৮০টি আঘাত করে ছিলেন যার ফলে ছেলের মৃত্যু ঘটে। এটা অবশ্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ঘটনা যা প্রত্যেকেরই জানা থাকার কথা। তবুও আমি বলছি, আবু শাহমা শয়তানের প্ররোচনায় মদ্য পান করে জেনা করেছিলো। সেই দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকটির অবৈধ গর্ভ ছিলো যার ফলে তার একটি পুত্র সন্তান জন্ম হয় এবং পুত্র সন্তানটি সে কোলে নিয়ে হযরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, এ সন্তান আপনার নাতী, অবৈধভাবে জন্ম হয়েছে। আপনার ছেলে আবু শাহমা আমার সঙ্গে জেনা করার ফলে এর জন্ম হয়। এ ঘটনা শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং ছেলে আবু শাহমাকে ধরে এনে দরবার সমক্ষে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। ছেলে সত্য গোপন না করে বললেন, ঘটনা সত্য। তিনি মদিনা মনোয়ারার মসজিদে নববীর চত্বরে সাহাবা রাদিআল্লাহু আনহুমদের সম্মুখে নিজ

হাতে এ অপরাধের শাস্তি স্বরূপ ছেলেকে ৮০টি দুররা (চাবুকের ঘা) মারবেন বলে স্থির করলেন, (যা এ অপরাধের জন্য শরীয়তের বিধান) কিন্তু ৭০ দুররা মারার পর ছেলেটি ইহলোক ত্যাগ করলো এবং ১০টি দুররা মৃত্যুর পর মেরে শরীয়তের বিধানের পূর্ণতা আনয়ন করলেন এবং পৃথিবীর বুকে রেখে গেলেন ন্যায় বিচারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এরপর তিনি আল্লাহ্ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করলেন এবং বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, আবু শাহমা এবার দোজখের আগুন হতে মুক্তি পেলো। বর্ণিত আছে হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু ঐ রাত্রিতে তাঁর ছেলেকে স্বপ্নে দেখলেন যে সে সবুজ জামা পরে বেহেস্তে বিচরণ করছে। আবু শাহমা পিতাকে দেখামাত্র তাঁর কদম মোবারকে পড়ে গেলেন এবং বললেন আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, কেননা আপনি আমাকে দোজখের আগুন হতে পরিত্রাণ করায়েছেন। এ ঘটনা বর্ণনার পর হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের বললেন, হযরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু-এর ন্যায় বিচারের ঘটনার মধ্যে এটা সমধিক প্রসিদ্ধ।

এরপরে আলোচনা ছিলো হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রাদিআল্লাহ আনহু সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চার প্রধান সহচরদের মধ্যে হযরত ওসমান রাদি আল্লাহু আনহু ছিলেন তৃতীয় এবং তাঁর জামাতা। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু' কন্যাকে একজনের মৃত্যুর পর অপরজনকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন যদি আমার একশত কন্যা থাকতো এবং পরিবেশ সৃষ্টি হতো তাহলে সকলকেই তাঁর নিকট বিয়ে দিতাম। আসমান ও জমীনের সকল বাসিন্দা তাঁর জন্য গর্ব করে। এরপর বললেন হযরত ওসমান রাদি আল্লাহু আনহুর যে পরিমাণ ধন-সম্পদ ছিলো সে সময়ে অতো অধিক ধন সম্পদ অন্য কারও নিকট ছিলোনা। তিনি অত্যন্ত দাতা ও দয়ালু ছিলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে একদিন হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু ধন-সম্পদের আধিক্যে অতিষ্ট হয়ে হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যেয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতায় অস্থির হয়ে উঠেছি প্রায় সময়ই নফল এবাদত করার সময় হয়ে উঠে না। আপনি দোয়া করুন যাতে আমার ধন-সম্পদ কমে যায়। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথায় রাজী হয়ে দোয়া করতে চাইলেন, এমন সময় হযরত জীব্রীল আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন

আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ হচ্ছে আপনি হযরত ওসমান রাদি আল্লাহু আনহু-এর জন্য এ দোয়া করবেন না, কারণ তিনি তাঁর মাল আল্লাহ্র রাস্তায় যথেষ্ট পরিমাণ দান করে থাকেন। আল্লাহ্ তাঁর সম্পদ এইজন্য বর্ধিত করেন যাতে সে আরও মুক্ত হস্তে দান করতে পারেন।

এরপর এরশাদ করলেন একবার পবিত্র রমজান মাসে হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সকল বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গী-সাথীদেরকে ইফতারের জন্য দাওয়াত করেছিলেন সন্ধ্যায় সকলেই সেথায় গমন করে ইফতার করলেন। হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু পরিপূর্ণ রূপে মেহমানদারী আদায় করলেন, আথিতীয়তায় কোনরূপ ত্রুটি ছিল না। আহার পর্ব সমাপনের পর হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে করজোড়ে দন্ডয়মান হয়ে আবেদন করলেন সৌভাগ্য আমার হুজুরের করুণায়। কিন্তু আপনি যে কষ্ট সহ্য করে আমি হেন অধমের গরীবালয়ে চরণ ধুলি দান করেছেন তাঁর শোকরিয়া কিভাবে আদায় হবে? তাঁর বাড়ী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুজরা হতে সত্তর কদমের পথ ছিল তাই তিনি তাঁর পবিত্র আগমনের শোকরিয়া স্বরূপ প্রতি কদমের জন্য এক একটি গোলাম আযাদ করে দিলেন। অর্থাৎ সত্তরটি গোলামকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে দিয়ে তাঁর আগমনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ কার্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে বললেন তোমার বাসনা পূর্ণ হয়েছে। সবশেষে তিনি হযরত ওসমান রাদি আল্লাহু আনহু-এর জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার মঙ্গল ও বরকত কামনা করলেন।

এরপর বললেন, হযরত ওসমান রাদি আল্লাহু আনহু-এর অগণিত ক্রীত দাস-দাসী ছিলো। একদিন তিনি এক দাসীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার হাত নিজের সান্নিধ্যে নিচ্ছিলেন। (পবিত্র কুরআনের বিধানে কৃতদাসী ভোগ করা জায়েজ আছে) হঠাৎ তাঁর বিবি নবী দুলালী হযরত উম্মে কুলসুম রাদি আল্লাহু আনহার দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তিনি হিংসা ও ঘৃণায় লাল হয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ একটি চাদর মুড়ি দিয়ে তাঁর পিতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করে কেঁদে কেঁদে উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মেয়ের মুখে এ ধরণের অভিযোগ শুনে মেয়ের প্রতি

অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং রাগান্বিত হয়ে বললেন, এখনই ফিরে যাও এবং স্বামীকে সন্তুষ্ট করো নতুবা কাল কিয়ামতে আমি তোমার মুখও দর্শন করবো না। এ দিকে হযরত ওসমান রাদি আল্লাহু আনহু বিস্ময়ে ও ভয়ে চিন্তিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন ঘটনা কি ঘটে দেখার জন্য। এমন সময় তার স্ত্রী নবী দুলালী লজ্জিত হয়ে আগমন করলেন এবং স্বামীর পদপল্লবে মাথা রেখে তার অপরাধের জন্য কাঁদতে লাগলেন। আমিরুল মু'মেনীন এ দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে বললেন, হে নবী দুলালী এটা কেমন দয়া যা তুমি এ অভাগার প্রতি প্রদর্শন করছো। তুমি তো জান যেখানে তোমার গৌরব সেখানে আমার কদমবুসি অর্থাৎ তোমার পিতার কদম মোবারকের নীচেই আমার ধন-মান-প্রাণ কোরবান। নবীকন্যা তখন ব্যাপারটা খোলসা করে বললেন যে, এ কাজ আমি স্বেচ্ছায় করি নি অর্থাৎ তুমি যাকে দয়া বলছো তা আমার নিজের ইচ্ছায় নয় এটা আমার পিতা ও আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ। আমিরুল মু'মেনীন একথা শ্রবণ করে আনন্দিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবি উম্মে কুলসুমের মাথার সদকা স্বরূপ ৩০০ ক্রীতদাসী আযাদ (মুক্ত) করে দিলেন। খাজা যিক্‌রুল্লাহ্ বিল খায়ের বললেন, কিয়ামতের দিন হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহুকে এতো উচ্চ মর্যাদা দান করা হবে যা দেখে সমস্ত আম্বিয়া আলাইহি ওয়া সাল্লামও হতবাক হয়ে যাবেন এবং দুঃখ করে বলবেন, হায়, আমি নবী না হয়ে ওসমান হতাম তা হলে আজ এ সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারতাম।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো আমিরুল মুমেনীন ও ইমামুল আশজাঈন মাওলা আলী কার্‌রামুল্লাহু ওহাজহু সম্বন্ধে। বললেন, হুজুর রাসূলে মাকবুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অতীতকালের নবীগণ যে লড়াইতে দুর্বিপাকে পড়তেন অথবা কোন কেল্লা (দুর্গ) জয় করতে পারতেন না তখন আল্লাহ পাক সেখানে হযরত আলী কার্‌রামুল্লাহু ওয়াজহুর চেহারা তুলে ধরতেন যার ফলে কেল্লা ফতেহ হতো অর্থাৎ দুর্গ জয় হতো।

একবার হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালাম হযরত আলী কার্‌রামুল্লাহু ওয়াজহুকে জঙ্গলের বর্বর দস্যু জাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বহুদিন যুদ্ধ পরিচালনা করেও জয়ী হতে পারছিলেন না। এ অবস্থায় একদিন তিনি এতো জোরে চীৎকার করেছিলেন যে সে আওয়াজ সাত আসমান জমীন কেঁপে উঠেছিলো। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ আওয়াজ

শুনতে পেয়েছিলেন এবং এর সাথে সাথে হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম সূরা ইখলাস নিয়ে অবতরণ করে আরজ করলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি এ সূরাটি হযরত আলী মুর্তুজার নিকট লিখে পাঠিয়ে দিন। তিনি এটা অধিক সংখ্যকবার পাঠ করলে ইন্‌শাল্লাহ যুদ্ধে জয়ী হবেন। হুযুর আক্‌রাম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ মোতাবেক সূরাটি লিখে নির্দেশ সহকারে হযরত আলী কার্‌রামুল্লাহু ওয়াজহুর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। হযরত মাওলা আলী কার্‌রামুল্লাহু ওয়াজহু প্রত্যেক দিন সূরাটি অধিক সংখ্যকবার পাঠ করতে লাগলেন এবং সত্ত্বর যুদ্ধে জয়ী হলেন।

এরপর এরশাদ করলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম লৌহ দ্বারা যুদ্ধের পোশাক বানাতে চাইলেন কিন্তু লোহা হাতে নিয়ে দেখলেন তাকে নরম করা সহজ নয়। তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য কামনা করলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে হযরত আলী কার্‌রামুল্লাহু ওয়াজহুর নাম নিতে বললেন, নির্দেশ মতো তিনি তাই করলেন। তখন আল্লাহ পাক হযরত আলী কার্‌রামুল্লাহু ওয়াজহুর নামের বরকতে লোহাকে মোমের মতো নরম করে দিলেন।

হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন কোন কারণে জঙ্গল ভ্রমণে বেরুলেন তাঁর সাথে ছিলেন হযরত আলী কার্‌রামুল্লাহু ওয়াজহু ও হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু। হযরত আলী কার্‌রামুল্লাহু ওয়াজহুর অভ্যাস ছিলো হযরত সালমান ফারসীকে পেলেই তাঁর সঙ্গে একটু কৌতুক করা। সুতরাং আজও তাঁকে তিনি পেয়ে ছোট ছোট পাথরের কণা তাঁর গায় মারতে লাগলেন, এরূপ ব্যবহারে হযরত সালমান ফারসী রাদি আল্লাহু আনহু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "হে আলী আমাকে পাথর মারতে তোমার লজ্জা হয় না? আমি বয়সে তোমার চেয়ে অনেক বড় এবং তোমার ছোট বেলায় আমি তোমাকে লালন-পালন করেছি।" হযরত আলী কার্‌রামুল্লাহু ওয়াজহু এ ধরণের তিরস্কারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। প্রথমে একটু বিব্রত বোধ করলেন। তারপর তিনি উভয়ের মধ্যকার একটা গোপন রহস্য প্রকাশ করে দিয়ে হযরত সালমান ফারসীর ব্যবহারের উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, "হে সালমান স্মরণ করুণ সেই দিনের ঘটনা যেদিন জঙ্গলে আপনি বাঘ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন সেদিন কে আপনাকে সে বাঘের ধারালো নখরের আঘাত হতে মুক্ত করেছিলো। আমার দিকে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন সে ব্যক্তি কি আমি নই? হ্যাঁ, আমিই সেদিন আপনাকে সে গহীন

জঙ্গলের ভয়াবহ অবস্থায় ব্যাঘ্রের কবল হতে মুক্ত করে ছিলাম। আসলে এটা ছিলো বহু পুরানো ঘটনা যখন হযরত আলী দুনিয়ায় আগমনই করেন নি অর্থাৎ তখনও তাঁর জন্মই হয়নি। হযরত সালমান ফারসী রাদি আল্লাহু আনহুর সম্মুখে ভেসে উঠলো সে দুর্দিনটির কথা এক জঙ্গলে তিনি ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য কামনা করলে হযরত আলী কার্‌রামুল্লাহু ওয়াজহু চেহারা মোবারক ব্যাঘ্রের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং ব্যাঘ্র প্রাণ ভয়ে শিকার ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনা স্মরণ হওয়ার পরই তিনি বুঝতে পারলেন হযরত আলীর শান ও মর্যাদা এবং তাঁর নিজের মুখ হতেই এ রহস্যের উন্মোচন হওয়ায় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং তাঁকে অভিবাদন করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

হযরত আলী কার্‌রামুল্লাহু ওয়াজহু এক রমজান মাসে হযরত ওসমান রাদি আল্লাহু আনহুর মতো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ সকল সাহাবা ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে ইফতারের দাওয়াত দিয়েছিলেন। ইফতারের সময় সকলেই এসে তাঁর জীর্ণ কুটীরে ইফতার করলেন। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর বিদায়ের সময় হযরত আলী কার্‌রামুল্লাহু ওয়াজহু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন হুযুর পাকের হুজরা হতে তাঁর ঘর ১৮ কদমের পথ এবং হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু ঘর ছিলো ৭০ কদমের পথ এবং তিনি হুযুর পাকের আগমনের শুকরিয়া স্বরূপ ৭০ জন ক্রীতদাসকে মুক্তি দিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর তো কিছু নেই তিনি কিভাবে তাঁর আগমনের শুকরিয়া আদায় করবেন। তাঁর এ চিন্তাযুক্ত অবস্থা থেকে তাঁকে মুক্ত করলেন স্বয়ং আল্লাহ জাল্লে শানহু। তিনি হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালামকে হুজুর পাকের নিকট পাঠিয়ে জানালেন যে হযরত আলী কার্‌রামুল্লাহু ওয়াজহুর বাড়িতে তাঁর আগমনের শুকরিয়া স্বরূপ আমি আপনার ১৮০০০ উম্মতকে দোজখের আগুন হতে মুক্তি দিবো।

খাজা জিকরুল্লাহ বিল খায়ের এরপর বললেন, আল্লাহ তায়ালা বেহেস্তে চারটি নহর প্রবাহিত রেখেছেন। নহর চারটির মধ্যে প্রথমটি পানির, দ্বিতীয়টি দুধের, তৃতীয়টি শরাব বা মদের এবং চতুর্থটি মধুর। হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহুর উপমা হচ্ছে পানির অনুরূপ। পানি সমস্ত প্রাণীজগতকে জীবিত রাখে।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ -

হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহুর উপমা হচ্ছে দুধ স্বরূপ। দুধে শক্তি বৃদ্ধি করে এবং শিশু দুধে জীবিত থাকে। যদি তারা দুধ না পায় তাহলে তাদের ক্রমবিকাশ ঘটে না অর্থাৎ দেহ বৃদ্ধি হয় না। ইসলামও হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর সময় অধিক শক্তিশালী হয়েছিলো। হযরত ওসমান রাদি আল্লাহু আনহুর উপমা হচ্ছে শরাবের নেশার ন্যায় যা নামাজীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাদের শক্তি ও সন্তুষ্টি আনয়ন করে। হযরত আলী কার্‌রামুল্লাহু ওয়াজহুর উপমা হচ্ছে মধুর ন্যায়। আল্লাহ তায়ালা মধুতে রোগের ঔষধ নিহিত রেখেছেন। হযরত আলী কার্‌রামুল্লাহু ওয়াজহু বিপথগামীদের জন্য ঔষধ স্বরূপ। সঠিক পথের সন্ধানীদের জন্য তিনি জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। যারা ইসলামের সঠিক পথে চলছে বলে দাবী করে তাদের পথ হযরত আলী কার্‌রামুল্লাহু ওয়াজহুর নির্দেশিত ও সংযোগ রক্ষাকারী পথের হতে হবে, যা তিনি হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্ সালাম হতে লাভ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বেহেস্তে চারটি চশমা বা ঝর্ণা প্রবাহিত রেখেছে। ঝর্ণাগুলোর নাম হচ্ছে। (১) সল্‌সবিল (উচ্চসিত ঝর্ণা), (২) যনজবীল (হাতীর শুঁড়ের ন্যায় ঝর্ণা), (৩) রহীক (উত্তম মদের ঝর্ণা), (৪) কাফুর (কর্পূরের ঝর্ণা)। পবিত্র কালাম কোরআন শরীফে বর্ণিত আছে–

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ـ وَعَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمقربون وَعَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ـ وَاِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ـ

এরপর বললেন, হে দরবেশগণ প্রথমেই আমরা এ চারটি নহর সম্বন্ধে বলেছি সুতরাং এ চারটে ঝর্ণার প্রতীক হচ্ছে আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী রাদি আল্লাহু আনহুম। যে ব্যক্তি এ চার বন্ধুকে দোস্ত মনে করবে সে চারটি নহরের ভাগ পাবে এবং আল্লাহ তায়ালাও তাঁকে বন্ধু বলে গ্রহণ করবেন। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে–

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِخْتَارَ اَصْحَابِىْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ سِوَى النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَاخْتَارَ مِنْ

اَصْحَابِىْ وَبَعَثَ فَجَعَلَهُمْ خَيْرًا وَهُمْ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ -

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আমার সাহাবাগণকে নবী রাসূল ব্যতীত সমস্ত আলমের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপদন করে সৃষ্টি করেছেন এবং সাহাবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর মনোনীত করেছেন চারজনকে। আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী রাদিআল্লাহু আনহুম।

এরপর এরশাদ করলেন আল্লাহ তায়ালা হাশরের দিন আমার উম্মতদের মধ্যে যারা সত্যবাদী তাঁদেরকে হযরত আবুবকর রাদি আল্লাহু আনহুর সঙ্গে, যারা বিখ্যাত কর্মসাধনকারী তাঁদেরকে হযরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহুর সঙ্গে, যারা বিনয়ী তাঁদেরকে হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে আলেমদেরকে মায়ায বিন যবল রাদিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে কোরআনের হাফেজদেরকে আবি ইব্নে কাব রাদিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে দরবেশদেরকে আবি আদ্দারদা রাদি আল্লাহু আনহুর সঙ্গে, যাহেদদেরকে আবিজর রাদি আল্লাহু আনহুর সঙ্গে, শহীদদেরকে আমীর হামজা রাদিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে, মুয়াজ্জেনদেরকে হযরত বেলাল রাদি আল্লাহু আনহুর সঙ্গে উত্তোলন করা হবে এবং এদের সকলেই বেহেস্তে যাবেন। এরপর বললেন, অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, আমার উম্মতদের মধ্যে হতে ৭০ হাজার লোককে আল্লাহ তায়ালা বিনা হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশাধিকার প্রদান করবেন। অবশ্য তারা হবে উপরোক্ত চার মহান খলিফাদের বন্ধুত্ব লাভকারীদের মধ্যে হতে।

اَبُوْ بَكْرٍ وَزِيْرِىْ وَالْقَائِمُ فِىْ اُمَّتِىْ بَعْدِىْ وَعُمَرُ حَبِيْبِىْ وَعُثْمَانُ مِنِّىْ وَعَلِىٌّ اَخِىْ وَصَاحِبُ لَوَائِىْ -

অর্থাৎ আবুবক্র আমার উজীর। আমার পরে আমার উম্মতদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে অর্থাৎ খলিফা হবে। ওমর আমার বন্ধু এবং ওসমান তো আমা হতেই। আর আলী আমার ভাই, আমার অস্ত্র, আমার ঝান্ডা ও আমার জ্ঞান।

হযরত আলী জন্ম লাভ করার পর তাঁকে নিয়ে আবু তালেব মূর্তি ঘরে যেয়ে জিজ্ঞেস করলেন এর নাম কি রাখব? মূর্তি ঘর হতে কোন উত্তর না পেয়ে কাবা ঘরে যেয়ে একই প্রশ্ন করার পর সেখান থেকে আওয়াজ এলো এর নাম আলী রাখ। অতএব এটা পরিষ্কার যে আলী নামটি স্বয়ং আল্লাহর দেয়া। নবীয়ে দু'জাহান সরওয়ারে কায়েনাৎ সরদারে দু'আলম হুজুরে পাক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্ সালাম এরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন নবীদেরকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু আমাকে ও হযরত আলীকে সৃষ্টি করেছেন একই রূপে। উপমা স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আমি যে গাছের মূল ও কান্ড হযরত আলী হচ্ছে যে গাছের শাখা-প্রশাখা এবং হাসান ও হুসাইন হচ্ছে সে গাছের ফল। বংশধর সমর্থনকারী ও আমার আশেকানরা হচ্ছে সে বৃক্ষের পাতা। সুতরাং যারা এদের কারও একজনের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন এবং সম্পর্ক বজায় রাখবে তারাই দোজখের আগুন হতে মুক্তি পাবে।

হযরত আলী কাররামুল্লাহু ওয়াজহু যখন মায়ের উদরে ছিলেন তখন তাঁর মা তৎকালীন আরবের নিয়মানুযায়ী যখন কোন মূর্তির উপাসনার জন্য যেয়ে মূর্তিকে সেজদা করতে চাইতেন, তখন হযরত আলী কাররামুল্লাহু ওয়াজহু পেটের ভিতরে মাথা উত্তোলন করে চাপ দিতেন তাতে তাঁর মা পেটে ব্যাথা অনুভব করতেন যার ফলে তিনি আর সেজদা করতে পারতেন না এবং মূর্তিকে সেজদা না করেই ঘরে ফিরে আসতেন।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য ও ভক্তি শ্রদ্ধা সম্বন্ধে। হযরত খা'জা বললেন, হে দরবেশগণ পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালাকেই সন্তুষ্ট করা এবং তাঁদেরকে দুঃখ-যাতনা দেয়া হচ্ছে আল্লাহ তায়ালাকেই কষ্ট দেয়া। যে সন্তানের প্রতি তার পিতা-মাতা সন্তুষ্ট নয় আল্লাহ তায়ালাও তার প্রতি সন্তুষ্ট নয়। হে দরবেশগণ, পিতা-মাতার দয়া ও স্নেহ-মমতাকে আল্লাহ তায়ালারই স্নেহ-দয়া মনে করবে। এরপর এরশাদ করলেন হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে ব্যক্তি দুঃখ কষ্ট করেও পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করেন। এরপর বললেন, আমি "আছারে আউলিয়া" গ্রন্থে লিখা দেখেছি, 'কোন এক বুজুর্গ একদিন কবরস্থানের ভিতর দিয়ে হাঁটছিলেন হঠাৎ একটা কবরের পাশে যেয়ে চমকে দাঁড়ালেন। তিনি কবরের ভিতর হতে ক্রন্দনের চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলেন। ওখানেই তিনি ক্ষাণিকক্ষণ দাঁড়ালেন এবং কবরটির ভিতরে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেলেন কবরবাসীর উপর আযাব হচ্ছে এবং কবরবাসী মা, মা, করে

চিৎকার করছে। বুজুর্গ তাকে বললো আল্লাহর নাম লও তাতে তোমার আযাব কম হবে। কবরবাসী বললো, হে বুজুর্গ জীবিত অবস্থায় আমার যখন কোন প্রকার কঠিন কষ্ট দেখা দিতো তখন আমি মা'কে ডাকলে আমার কষ্ট দূর হতো এবং শান্তি পেতাম। অতএব আজও আমি সেই পূরানো অভ্যাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। কি উত্তমই না হতো যদি আল্লাহ তায়ালা এতেই আমার আযাব মাফ করে দিতেন। সে এ বাক্যটি উচ্চারণ করার সাথে সাথে তার আযাব বন্ধ হয়ে গেলো এবং তাকে মাফ করে দেয়া হলো। আজও সে তার মায়ের সৌজন্যে ক্ষমা পেলো। এ ঘটনা বলতে বলতে হযরত খা'জার চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন– آرے ہمچنیں است - আরে হাম চুনিয়াস্ত। হ্যাঁ এরূপই হয়। মাতা-পিতার নাম লওয়া এবং তাঁদের সম্মানের দৃষ্টির সম্মুখে রাখলে সন্তানরা ক্ষমা পায় এবং এরূপ সন্তানেরাই শান্তিতে থাকে ও কৃতকার্য হয়। যারা পিতা-মাতার হক (কর্তব্য) পূর্ণরূপে আদায় করে এবং এ নিয়মের অনিয়ম করে না তারাই সফলতা লাভ করে। মাতা-পিতার পায়ের নীচেই সন্তানের মঙ্গল ও বেহেস্ত।

হযরত খা'জা যখন তাঁর বক্তব্যে এ পর্যন্ত পৌঁছলো তখন আযানের ধ্বনি কানে এলো। তিনি তাঁর অমিয় বাণীতে বিরতির চিহ্ন টেনে নামাজের ইচ্ছা পোষণ করলে সবাই তাকে অনুসরণ করলো। মজলিস ভঙ্গ হলো।

–আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

ত্রয়োদশ মজলিস

বুধবার, ৯ই জমাদিউল আউয়াল, ৬৯০ হিজরী। কদমবুসির লাভের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। আলোচনা চলছিলো আহ্‌লে সুলুক ও দরবেশী সম্বন্ধে। এদিন মজলিস শরীফে মাওলানা সামসুদ্দিন এহ্‌ইয়া, মাওলানা ফকরুদ্দীন যারাদী, মাওলানা বুরহানউদ্দীন গরীব ও অন্যান্য সূফি দরবেশ খেদমতে হাজির ছিলেন। হযরত খা'জা এরশাদ করলেন, কিছু সংখ্যক তরীকার মাশায়েখ (পীরগণ) রহমকুমুল্লাহ সুলুকের ১০০টি স্তর নির্ধারণ করেছেন। এর মধ্যে কাশ্‌ফ ও কারামতের স্তর হচ্ছে ১৭তম। যে ব্যক্তি এ স্তরে কাশ্‌ফ ও কারামত (গুপ্ত বাক্য ও অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে জানার জ্ঞান) প্রকাশ করে সে পরবর্তী সোপানে আরোহণ করার সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়। সেই শক্তিধর বীর-পুরুষ যে এ স্তরে নিজেকে গোপন রেখে পরবর্তী স্তরগুলো অতিক্রম করে। কিন্তু শাহ শোজা কিরামানী ও বায়েজীদ বোস্তামী রাদি আল্লাহু আনহুমা বলেছেন সুলুকের স্তর হচ্ছে ৫০টি এবং দশম স্তর হচ্ছে কাশ্‌ফ ও কারামাতের। তাঁদের তরীকার নিয়ম হচ্ছে যারা নবম স্তর অতিক্রম করে দশম স্তরে পদচারণা করে তারা ইচ্ছা করলে কাশ্‌ফ ও কারামত প্রদর্শন করতে পারে। আমাদের খাজেগানে চিশ্‌তদের নিয়ম হচ্ছে সলুকের পথে সর্বমোট স্তর হচ্ছে মাত্র ১৫টি এবং কাশ্‌ফ ও কারামতের স্তর হচ্ছে ৫ম। যে ব্যক্তি ৫ম স্তরে নিজেকে প্রকাশ করে ও কাশফ কারামত প্রদর্শন করে সে অত্যন্ত দুর্ভাগা। কারণ তারা অবশিষ্ট স্তরগুলো অতিক্রম করতে পারে না। আর যারা ৫ম স্তরে আত্মাগোপন করে তারা পরবর্তী স্তরগুলো অতিক্রম করার সৌভাগ্যে ভাগ্যবান হয়। অর্থাৎ ধৈর্যসহকারে কষ্টকে অঙ্গের ভূষণ মনে করে যারা অতি সন্তর্পণে বাকি স্তরগুলোতে টিকে থাকতে পারে তারাই এ পথের বীর ও যথার্থ পুরুষ এবং এরাই অর্জন করতে পারে কামালিয়াত। হযরত খা'জা যখন তাঁর অমিয়বাণী এ পর্যন্ত পৌছালেন তখন খা'জা শামসুদ্দিন এহ্‌ইয়া আদবে জমিনে চুমু খেয়ে এবং অনুমতি নিয়ে বললেন, অন্যান্য তরীকার মাশায়েখ সুলুকের ১০০টি স্তর নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু আমাদের মাশায়েখ নির্ধারণ করেছেন মাত্র ১৫টি। এ ১০০ ও ১৫ স্তরের কারণ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান দান করলে উপকৃত হতে পারতাম। মনজিল যখন সবারই এক তখন পথে এতো জটিলতার

কারণ কি? উত্তরে হযরত খা'জা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের বললেন, কারণ অবশ্যই আছে; শুন বলছি, তোমরা জান যে অতীতের প্রথম দিকের আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামের আয়ুস্কাল ছিলো অনেক লম্বা। অনেকে হাজার হাজার বছর আয়ু পেয়েছিলেন। তাঁদের মুজাহিদা ও মোশাহিদাও সে তুলনায় ছিলো লম্বা এবং আনুপাতিক হারে নে'য়ামতও হাসিল হতো কম। কিন্তু আমাদের হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম দুনিয়ায় আগমনের মাত্র ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন এবং তাঁকে যে অগণিত মু'জেজা অনুদান দেয়া হয় যা কল্পনা করা সম্ভব নয়। দুনিয়াতে তাঁর আয়ুস্কাল ছিলো মাত্র ৬৩ বছর যা অতিক্রান্ত করার পর তিনি স্রষ্টার সান্নিধ্যে চলে যান। তাঁর নে'য়ামত তাঁর উম্মতগণ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন। আমাদের চিশ্‌তীয়া তরীকার মাশায়েখগণ যেহেতু সরাসরি সেই নেয়ামত ও অনুদান প্রাপ্ত, সেহেতু সল্প সময়ে সম্পূর্ণ পথ অতিক্রমের সহজ পদ্ধতিটি প্রয়োগ করেছেন, যা বর্তমানে খাজেগানে চিশ্‌তগণ করে থাকেন।*

মুজাহিদা ও মুশাহিদা অতীতের আউলিয়াগণ যতটা করতে পারতেন সময়ের অভাবে আমাদের মাশায়েখ তা করতে পারেন না। কিন্তু নেয়ামত অনুদান ও কারামাত বেহিসাবে লাভ করে থাকেন। তাঁরা অতি অল্প সময়ে অল্প পরিশ্রমে সুলুকের স্তরগুলো অতিক্রম করে মনজিলে মাকসুদে পৌঁছে যান। ঠিক এরই অনুরূপ একটি প্রশ্ন ও তার আলোচনা হয়েছিলো খাজেগানে চিশতদের রত্ন-ভান্ডারের একরত্ন আমাদের পূর্ব-বুজুর্গ হযরত খাজা মওদুদ চিশতী রাদিআল্লাহু আনহু; যিনি হযরত খাজা শায়খ গরীব নওয়াজের পীরের দাদা পীর ছিলেন। তাঁর মজলিস শরীফে তিনি বলেছিলেন সুলুকের পথে সেই কামেল বীর

* আর একটু বিশ্লেষণ করে বলতে গেলে বলতে হয় যে সুলুকের পথের অভিজ্ঞান ও নেয়ামতগুলো যা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজ শরীফ হতে সরাসরি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট হতে লাভ করে তাঁর নির্দেশনুযায়ী হযরত আলী কাররামুল্লাহু ওয়াজহুকে দান করেন এবং পরবর্তীতে সে খাজানা হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহ আলাইহির হাত ঘুরে হযরত খাজা আব্দুল ওয়াহিদ বিন যায়েদ রহমতুল্লাহি হয়ে যে পথ দিয়ে আগমন করে সে পথের শিকলের নাম চিশ্‌তিয়া। এছাড়া আরও একটি কথা আছে। সেটি হচ্ছে যে একজন শায়খ মাত্র একজন শিষ্যকে সাজ্জাদানশীন করতে পারেন যা নিয়ন্ত্রিত হয় একমাত্র হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা। কোন শায়খ দু' ব্যক্তিকে সাজ্জাদানশীন করতে পারেন না, যদিও খেলাফত দিতে পারেন অগণিত শিষ্যকে। আমরা আমাদের খাজেগানে চিশ্‌ত ও তাঁদের রচনা হতে পরিষ্কারভাবে জানতে পেরেছি যে আল্লাহ্ প্রদত্ত সে দরবেশী খিরকা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাছলা ও আসা ইত্যাদি সমস্ত নিয়ামতের অভিজ্ঞান আজও চিশ্‌তিয়া মাশায়েখদের মধ্যেই রয়েছে। তাই এ তরীকা এতো সমৃদ্ধ।

যে তাসউওফের ১৫টি স্তর অতিক্রম করতে পারে এবং মাঝ পথে কোথাও কাশ্‌ফ ও কারামত প্রকাশ করে না। এমন অবস্থায় তাঁর এমন মানসিক শক্তি ও যোগ্যতা অর্জিত হয় যে তাঁর শ্বাস যদি মুর্দার উপর পতিত হয় তাহলে সে মুর্দাও জীবিত হয়ে উঠে আল্লাহ জাল্লে শানহুর আদেশে। হযরত খাজা মওদুদ চিশ্‌তী রাদিআল্লাহু আনহু যখন এ অমিয়াবাণী বর্ণনা করছিলেন, তখন এক বৃদ্ধা বিলাপ করতে করতে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, এ অভাগীর একমাত্র পুত্রসন্তানকে এ শহরের বাদশা বিনা কারণে, বিনা বিচারে ও অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। হে খা'জা আপনি এর সুবিচার করুন। হযরত খাজা মওদুদ চিশ্‌তী রাদি আল্লাহু আনহু বৃদ্ধার এ অভিযোগ শ্রবণ করে মজলিসে উপস্থিত সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনা স্থলে গমন করলেন। তখনও বৃদ্ধার ছেলের লাশটি সেখানেই পড়ে ছিলো। খা'জা সে লাশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললেন, যদি তোমার মৃত্যু বিনা কারণে ও বিনা দোষে হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ জাল্লে শানহুর হুকুমে জীবিত হও। মৃত যুবক আদেশ পাওয়া মাত্র জীবিত হয়ে উঠলো। এরপর হযরত খাজা মওদুদ চিশ্‌তী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ্য করে বললেন। তোমরা এখন যা দেখলে তা একজন কামেল বীরপুরুষের মর্যাদা। যখন সালেক তাসাওউফ ও সুলুকের পথের সম্পূর্ণ স্তরগুলো অতিক্রম করে মনজিলে পৌঁছে তখন তাঁর মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেউ অনুধাবন করতে পারে না।

পরের আলোচনা দরবেশী সম্বন্ধে শুরু হলো, তিনি বললেন, যেদিন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্ সালাম ফকিরীর খিরকা কবুল করেছিলেন সেদিন আল্লাহ তায়ালা জিব্রীল আলাহিস্ সালামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'হে জিব্রীল তুমি আমার বন্ধুর নিকট দুনিয়ার ঐশ্বর্য এবং গরিবী (দারিদ্র) এ উভয় জগতই তাঁর নিকট উপস্থাপন করো। নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে তিনি আদেশ পালন করলেন। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম দু'জাহানের সমস্ত বস্তু প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। মুহাক্কেকগণ লিখেছেন তিনি প্রথমে দুনিয়ার সকল ঐশ্বর্যমন্ডিত বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দুনিয়া তখন গর্ব করে বলে উঠলো, 'আমিই শ্রেষ্ঠ।' কেননা আমার প্রতিই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের দৃষ্টি প্রথম পড়েছে। এরপর তিনি অভাবী জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং দারিদ্রতাকে গ্রহণ করলেন। যখন তিনি ফকিরী গ্রহণ করলেন তখন আল্লাহ তায়ালার ফরমান এলা 'হে বন্ধু! আপনি দুনিয়াকেও গ্রহণ

করুন আমি আপনাকে বিনা হিসাবে তা দান করছি, কিন্তু আমাদের দয়াল নবী উত্তরে বললেন, দুনিয়ায় আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি দারিদ্রকে গ্রহণ করেছি।

এরপর বললেন তরীকর মাশায়েখ (রহমতুল্লাহি আলাইহুম) প্রকৃত জাহেদ তাঁদেরকে বলেন, যারা সমস্ত প্রাচুর্যের মাঝে থেকেও নিজেকে পৃথক রাখে। আর যার কাছে দুনিয়ার ঐশ্বর্য নেই তাকে দুনিয়া বর্জনকারী বলা যায় না। কেননা দুনিয়াই তাকে বর্জন করেছে। এরপর বললেন, আমি আমার পীর ও মুর্শেদ হযরত শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহির মুখে শুনেছি তিনি বলেছেন, দরবেশীর সত্তরটি সোপান বা ধাপ রয়েছে। সুলুকের স্তরগুলো শেষ করার পর সে যখন দরবেশীর প্রথম সোপানে অবস্থান করে তখন সে যদি জমিনের দিকে তাকায় তাহলে সে মৃত্তিকার শেষ স্তর (তাহ্তে আছরা) পর্যন্ত দেখতে পায় এবং যদি আকাশের দিকে তাকায় তাহলে সে হেজাবে আজমত পর্যন্ত দেখতে পায়। দরবেশীর এটাই হচ্ছে প্রাথমিক স্তর এবং এর পরবর্তী ৬৯টি স্তর অর্থাৎ দরবেশীর প্রথম ৭০টি স্তর হচ্ছে সাধারণ স্তর। এ ছাড়া বহু দরবেশ আছেন যারা ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) স্তর অতিক্রম করেছেন। তাঁদের রুহ সর্বশেষ্ঠ স্তর পর্যন্ত ভ্রমণ (ছায়ের) করেছেন। তাঁদের অবস্থা ও অবস্থান সাধারণ মানুষের চিন্তা ও কল্পনার বহির্ভূত। পূর্ণ দরবেশীর যেমন ৭০ হাজার স্তর বা ধাপ রয়েছে তেমনি ৭০ হাজার আলম বা জগতও রয়েছে। দরবেশদের এ সত্তর হাজার জগতের সব জগত সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে হয়,তাহলে সে কামেল দরবেশ রূপে পরিগণিত হবে। এ কথা বলতে বলতে খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়েরের চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি ভারাক্রান্ত কণ্ঠে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, যদি পুঞ্জিভূত আয়ু সুদীর্ঘ হয় এবং কার্যে দৃঢ়তা অবলম্বন করা যায় তাহলে রহস্যগুলো অবশ্যই উন্মুক্ত হতো কিন্তু আমাদের আয়ুস্কাল কম। এ রকম দরবেশ বহু আছে যারা প্রথম স্তরে অবস্থান করার সময় মোরাকাবায় দশ হাজার জগত (আলম) ভ্রমণ (ছায়ের) করে আসে। এরপর বললেন যে, যদি দরবেশদের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতে না থাকতো তাহলে অবশ্যই এ পৃথিবী রোগ-শোক ও দুঃখ-দৈন্যে (বালা-মুসিবত) ধ্বংস হয়ে যেতো। দরবেশদের কদমের বরকতে আল্লাহ তায়ালা বালা-মুসিবত দূরে রাখেন। এরপর বললেন, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম এর এক প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেন, "হে মূসা যদি জগতে দরবেশ না থাকতো তাহলে অবশ্য মালদারদেরকে জমিন গিলে

ফেলতো। হে মূসা যে স্থানে দরবেশ আছে সে স্থানে রহমত ও মাগফেরাতের দরজা উন্মুক্ত থাকে।" এরপর বললেন, যদি কখনও দরবেশ এক শহর পরিত্যাগ করে অন্য শহরে গমন করেন তাহেল বুঝবে দরবেশের পরিত্যক্ত শহরটিতে বালা মুসিবত নাজিল হবে এবং যে শহরে তিনি পদার্পণ করবেন সে শহর হতে বালা-মসিবত দূর হয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে হযরত খা'জা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করে বললেন, অতীতে এক দরবেশ তাঁর নিজের শহর ত্যাগ করে গুজরাট শহরে পদার্পণ করেছিলেন। তাঁর আগমনের পূর্বে শহরটিতে মহামারী দুর্ভিক্ষ ও নানা প্রকার বালা-মুসিবতে পূর্ণ ছিলো। কিন্তু সেখানে তাঁর পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বালা-মুসিবত দূরীভূত হতে লাগলো এবং এক সময় শহর একেবারে বালা-মুসিবত হতে মুক্ত হলো। যে বছর তিনি সেখানে গেলেন সে বছর সেখানে আর কোন অভাবও দেখা দেয়নি। নগরীর বাসিন্দারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করলো। দেশের অবস্থা হঠাৎ করে এমন পরিবর্তন হওয়ায় বাসিন্দারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লো। সেখানকার শাসনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানবান ছিলেন। তিনি ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরে তার লোকদেরকে হুকুম দিলেন, "দেখো এ শহরে অবশ্যই কোন নূতন বিশেষ ব্যক্তির আগমন ঘটেছে, অনুসন্ধান করে তাঁকে খুঁজে বের করো"। অনেক অনুসন্ধানের পর বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে সেই নবাগত বুজুর্গকে চিহ্নিত করা হলো। তাঁকে শাসনকর্তার সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো। তিনি শাসনকর্তার লোকদের সাথে রাজ দরবারে গমন করলেন। শাসনকর্তা ছিলো হিন্দু। সে বুজুর্গকে অত্যন্ত সম্মান সহকারে তার পাশের আসনে বসালেন এবং অনেক অনুনয় বিনয় করে বললো, আপনার কদম আমাদের মস্তক ও চোখের মণি। প্রত্যেক বছর আমাদের এখানে বালা-মুসিবত নাজিল হতো। কিন্তু আপনার পবিত্র আগমনে আমাদের মুক্তি এসেছে। এ কথা বলে হিন্দু শাসনকর্তা তাঁর নিকট মুসলমান হয়ে গেলো। এরপর বললেন, দরষেশদের কদম যে স্থানে পড়ে সে স্থান হতে বালা দূর হয়ে যায়। দরবেশদের একবার توجه তাওয়াজ্জোহতে বালা নিঃশেষ হয়ে যায়। এরপর এরশাদ করলেন, যে শহরে মিথ্যা দরবেশীর দাবী হয়, মিথ্যার বেসাতি হয়, পরনিন্দা ও পরচর্চা করা হয় এবং অন্যায় অত্যাচার সংঘটিত হয় সে শহরে কোন প্রকার শান্তি আগমন করে না।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো ইসলাম সম্বন্ধে। হযরত খা'জা বললেন ইসলাম দাবী করা অত্যন্ত সহজ কাজ। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানের কাজ করা অত্যন্ত কষ্টের কাজ। মুসলমানের কাজ করার উদাহরণে তিনি হযরত খা'জা বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহির সম্বন্ধে কিছু ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, হযরত খা'জা বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি ৭০ (সত্তর) বছর নিজের নফ্সকে বিভিন্ন মোজাহিদায় মশগুল রেখেছিলেন। কখনও এক বছর পর্যন্ত কখনও দু'বছর পর্যন্ত পানি পান করেন নি। লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করতো এটা কি ধরণের জেহাদ? উত্তরে তিনি বলতেন, আমাকে মুসলমান কেন বলা হয়? আর যদি আমি সত্যি মুসলমান হই তাহলে এটা কেমন অসম্ভব কথা যে আমাকে মুসলমান বলা হবে অথচ আমি মুসলমানের কাজ করবো না? তিনি এরপর বললেন, হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহির জামানায় কোন এক সময়ে কিছু ইহুদীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, "তোমরা মুসলমান হও না কেন? উত্তরে তারা বলেছিলো, "মুসলমানী যদি এটাই হয় যা তোমরা কর তাহলে আমাদের শুধু মাত্র ঐ মুসলমান নাম গ্রহণ করতে লজ্জা হয়। আর মুসলমানী যদি ঐ কাজ হয় যা হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি করেন, তা হলে বলবো যে ঐ রকম মুজাহিদা ও রিয়াজত আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়।" ঘটনা এ পর্যন্ত বলার পর হযরত খা'জা বুরহান উদ্দিন গরীব রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন মনোয়ার হাসবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মজলিসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের সাথে কাওয়াল ছিলো। হযরত খাজা তাদেরকে সসম্মানে বসতে দিলেন।

এরপর আলোচনা শুরু হলো "সামা" বা গান সম্বন্ধে। হুজুর বললেন, সামা শ্রবণ ও উপলব্ধির বিষয়। শ্রোতাদের উচিত নিগূঢ়ভাবে খেয়াল করে 'সামা' বা গান শ্রবণ করা এবং গায়কের কথাগুলো অনুধাবন করে তার মর্মে পৌঁছে ধ্যান-মগ্ন হয়ে থাকা, যাতে প্রেম তরঙ্গ তরাঙ্গয়িত হয়ে হৃদয় বীণায় ঝঙ্কার তুলে তাকে 'ওজদ' (ঐশী অচৈতন্য অবস্থার জগত, যেখানে মানুষ আমিত্বকে ভুলে যায়) এর জগতে বহন করে নিয়ে যায়। এ কাজ অবশ্য প্রেমিকদের। যদি শ্রোতা প্রেমাস্পদের বিরহ ব্যথায় ব্যথিত না হয় তাহলে বন্ধুর হাজারও রহস্যের কথা শ্রবণ করলেও সে কখনও তার ক্ষুদ্রাংশের মর্মও উপলব্ধি করতে পারবে না। এরপর বললেন, আমি যখন আমার পীর ও মুর্শেদের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম

তখন তাঁরা পবিত্র জবান হতে শুনেছি যে একবার হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী, কাজী হামিদউদ্দিন নাগোরী, খাজা শামসুউদ্দিন তুর্ক, মাওলানা আলাউদ্দিন কিরমানী ও শায়খ মাহ্মুদ রহমতুল্লাহি আলাইহি এক সঙ্গে ছিলেন এবং তখনকার পরিবশটা ছিলো অত্যন্ত শান্তিময়। সে সময় আমার দাদা পীর হযরত খা'জা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর খানকায় 'সামা' অর্থাৎ গান হচ্ছিলো। সকলেই ঐশী-অচৈতন্য লোকে ধ্যান-মগ্ন ছিলেন। ঐ অবস্থাতেই তাঁরা তিন অহোরাত্র দরবেশী নৃত্যে অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের দেহের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। এ ঘটনা বলতে বলতে হযরত খা'জা যিকরুল্লাহ্ বিল খায়েরের চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন 'সামা' তাকেই বলে যা ঐসব বুজুর্গ শুনতে ছিলেন। এ কথা শ্রবণ করার সাথে সাথে হযরত শায়খ ওসমান সিয়াহ দাঁড়িয়ে কড়জোরে আরজ করলেন যে কাউয়াল উপস্থিত আছে যদি আপনি অনুমতি দেন তো সে 'সামা' পরিবেশন করতে পারে। তিনি অনুমতি দিলেন। কাউয়াল (গায়ক) রাগ পরিবেশন করতে আরম্ভ করলো। প্রথম স্তবক শোনার পরই হযরত খা'জা এক অদ্ভুত ও আশ্চর্য অবস্থার মধ্যে অবগাহন করলেন। অবশ্য এ হাল বা অবস্থা তাঁর জন্য সাধারণই ছিলো। কিন্তু তাঁর এ হাল শায়খ ওসমান সিয়াহও উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের উপর এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করলো। সকলেই ঐশী-অচৈতন্যলোকে অবস্থান করে নৃত্য করতে করতে হযরত খা'জার কদম মোবারকে পতিত হয়ে আবার উঠে যাচ্ছিলেন এবং নৃত্য করছিলেন। পুনরায় তাঁর পদ পল্লব হতে ঐশী আকর্ষণ গ্রহণ করে আল্লাহ তায়ালার প্রেমে আকর্ষিত হয়ে নৃত্য করছিলেন। তাঁদের হাল যে কি প্রকার হয়েছিলো এবং ওজদ-এর কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন তা এ লেখনীর দ্বারা লিখে বুঝানো সম্ভব নয়। তাঁদের এ হাল চাশ্ত্-এর (সূর্যোদয়ের পর) সময় হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। এরপর হযরত খা'জা আস্তে করে বসে পড়লেন এবং অন্যান্যরাও তাঁকে অনুসরণ করে বসে পড়লেন। হযরত খাজা তার নিজের পরিধেয় খিরকাটি (আজানু লম্বিত জামা) শায়খ ওসমান সিয়াহ রহমতুল্লাহি আলাইহিকে দান করলেন এবং আমি অধমকে দান করলেন তাঁর বিশিষ্ট কুল্লাহ (টুপী)। মজলিস এখানেই সমাপ্ত হলো।

যে কাসিদার মধ্যে সকলের ওজ্‌দ্‌ ও হাল হয়েছিলো সেটি নিম্ন প্রদত্ত হলো–

هزار سختی اگربر من آید آسانست
که دوستی وارادت هزار چند انست
سفردرازبناشد بپائے طالب دوست
که خاردشت محبت گل است دریحانست
اگرتوجور کنی جورنیست دیداراست
اگرتو داغ نهی داغ نیست درمانست
نه آبروی که گرخون من بخواهی ریخت
مخالفت تکنم آن کنم که فرمانست
گمان برند که درباغ دیده عشق گلے است
نظربه سیب زنخدان ونار پستانست ۔

–আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

চতুর্দশ মজলিস

রোববার, ২০ শে জমাদিউল আউয়াল, ৬৯০ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করে ঐশ্বর্যবান হলাম। আলোচনা চলছিলো প্রেমের রহস্য সম্বন্ধে। এ দিন পবিত্র মজলিসে মাওলানা শামস্উদ্দিন এহ্ইয়া, মাওলানা ফখরুদ্দিন যারাদী, মাওলনা বুরহানুদ্দিনী গরীব, আমীর হাসান সঞ্জরী এবং অন্যান্য সূফি দরবেশ রহমতুল্লাহি আলাইহিম খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। হযরত খাজা এরশাদ করলেন, মাওলার নূর ও রহস্যের জন্য অদম্য আশা-আকাংখা থাকা উচিত। যাতে বন্ধুর রহস্য তার ভিতরে স্থান করে নিতে পারে। প্রথম পর্যায়েই যেন বন্ধুর নূর তাঁর অন্তরের স্থান হয় সে বিষয়ে অতীব যত্নবান হওয়া দরকার। সালেকের মনে যদি এরূপ বাসনার তৃষ্ণা না থাকে তাহলে আগত রহস্য ভিতরে স্থান না পেয়ে তা তার নিকট হতে প্রকাশ হয়ে পড়বে। এর ফলে সে আর পরবর্তী রহস্য প্রাপ্তির পাত্র হিসেবে বিবেচিত হবে না। এরপর ইরশাদ করলেন, হে দরবেশগণ, সুলুকের পথে সেই কামেল পুরুষ হয় যে বন্ধুর (আল্লাহ তায়ালা) নিকট হতে প্রাপ্ত রহস্যকে প্রকাশ না করে নিজের মাঝে লুকিয়ে রাখে। যে ব্যক্তি সে রহস্য প্রকাশ করে দিবে তার অবস্থা মনসুর হাল্লাজের মতো হবে, সে (মনসুর হাল্লাজ) নিজেকে ধ্বংস ও নষ্ট করেছে। এরপর বললেন, এক বুজুর্গ তাঁর এক বুজুর্গ বন্ধুকে লিখেছিলেন, "আপনি সে রকম লোককে কি মনে করেন, যারা একবিন্দু রহস্যতেই ঝলকে উঠে?" তাঁর বন্ধু উত্তরে লিখেছিলেন, "এমন লোকের আকাঙ্ক্ষা থাকে অত্যন্ত নিম্ন স্তরের, এ পথে এমন হতে হয় যেন শত শত রহস্যের নদী পান করলেও তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হয়, অর্থাৎ- هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ এ কথা বলে চিৎকার করে উঠলেন। বন্ধু-বান্ধব বা অন্য কোন সম পর্যায়ের সালেকদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা না করাই ভালো, কেননা তাতে একে অপরের নিকট লজ্জিত হতে হয়।" এরপর বললেন, আমি সুলুকের কিতাবে লিখা দেখেছি, 'এ পথে সেই খাটী ও বিশ্বাসী যে অদৃশ্য-জগৎ হতে প্রাপ্ত রহস্য ও বালাতে অটল ও সন্তুষ্ট থাকে। কালাম পাকে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا
وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আফরিগ আলাইনা ছাবরাও ওয়া ছাব্বিত ইকদা মানা ওয়ানছুরনা আলাল কাওমিল কাফেরীন।

এরপর বললেন, মুফাস্‌সেরগণ (কোরআনের ব্যাখ্যাকারীগণ) এ আয়াতকে ধৈর্যের অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট করে বলেছেন, দরবেশ তাঁরাই যাঁরা বন্ধুর নিকট হতে আগত বিপদ দৃঢ় হৃদয়ে গ্রহণ করে এবং তাতে ধৈর্যধারণ করেন। এরপর এরশাদ করলেন প্রেমিক তাঁরাই যারা সম্মান ও অসম্মান উভয় অবস্থায় একইভাবে থাকেন এবং সুলুকের পথে কামেল তাঁরাই যাঁরা দুনিয়ার কর্মে ব্যস্ত থাকা সত্যেও বন্ধুর প্রেমে বিভোর থাকে এবং যা কিছু হাসিল হয় তার জন্য গর্ব বা অহঙ্কার না করে নিজেকে সব সময় নিকৃষ্ট মনে করে।

এরপর বললেন, খা'জা আব্দুল্লাহ সহল তসতরী রহমত্‌ল্লাহি আলাইহি কুল্লাহ্ চাহার তর্‌কী (চার টুকরা কাপড়ে তৈরী টুপী) সম্বন্ধে লিখেছেন, এ টুপীতে যে চারটে টুকরো রয়েছে তার অর্থ নিনম্নরূপ –

* প্রথম টুকরা বা ঘরের অর্থ হচ্ছে নূর ও রহস্য।
* দ্বিতীয় টুকরা বা ঘরের অর্থ হচ্ছে মুহাব্বত ও তাওয়াক্কুল।
* তৃতীয় টুকরা বা ঘরের অর্থ হচ্ছে ইশ্‌ক ও প্রেম।
* চতুর্থ টুকরা বা ঘরের অর্থ হচ্ছে সন্তুষ্টি।

এরপর ইরশাদ করলেন, যে দরবেশ কুল্লাহ চাহার তর্‌কী পরিধান করে তাদের উচিত উপরোক্ত জিনিসগুলো ভালোভাবে উপলব্ধি করা এবং সেভাবে চলা। কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, এ টুপী বন্ধুত্বের চিহ্ন এবং এ পথ সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ। এ পথে সেই কৃতকার্য যে এ টুপীর কদর জানে এবং এর নিশান হচ্ছে আহ্‌লে তাকীয়া'র। অর্থাৎ টুপী পরিহিত তরীকত-পন্থী দল।

درطاقیه جمله عشق وشوق ست همه

سوگند بعشق اوکه شوق ست همه

উচ্চারণ ঃ দর তাকিয়া জুমলাহ ইশ্‌ক্ ও শাওকাস্ত হামা
সুগন্দ বাইশ্‌ক্ উ কে শওকাস্ত হামা।

অর্থ ঃ প্রেম ও প্রেমিকের চিহ্ন রয়েছে পূর্ণ তাকিয়ার মাঝে
প্রেমের সুগন্ধ রয়েছে প্রেমিকের পূর্ণতা।

এরপর বললেন, হযরত খা'জা শহীদুল মুহাব্বাত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহ আলাইহি এর খানকার একটা মর্যাদা ছিলো যে প্রত্যেক দিন তাঁর দরবারে কম করে হলেও দু'শ লোক বায়াত হওয়ার জন্য উপস্থিত হতো। তিনি বায়াত করে প্রত্যেককে একটি করে কুল্লাহ্ চাহার তরকী (টুপী) দান করতেন এবং বলতেন তোমাদের মধ্য হতে যদি কেউ তরীকার খেলাফ চলো তাহলে এ টুপীই তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাঁর কারামতের মধ্যে এটাও একটা প্রকাশ্য কারামত ছিলো যে তাঁর মুরিদানের মধ্যে কেউ তরীকার খেলাফ চলতো না। এরপর বললেন, হে দরবেশ আহলে তাকীয়াদেরকে (টুপী পরিধানকারী দলের) তাঁদের অনিয়মের জন্য এ টুপী সাজা দান করে ঠিকই কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারে না যে শাস্তি কোথা হতে এলো। এরপর বললেন, যে ব্যক্তি কুল্লাহ চাহার তরকীর হক আদায় করবে, সে দুনিয়া ও আখেরাতের কোথাও দুর্ভাগা হবে না। হযরতের বক্তব্য এ পর্যন্ত পৌছলে আযান হয়ে গেলো। তিনি নামাযে নিমগ্ন হলেন অন্যান্যরাও তাঁকে অনুসরণ করলো। মজলিস শেষ হলো।

– আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

পঞ্চদশ মজলিস

বৃহস্পতিবার, ১০ই শাবানুল আযম, ৬৯০ হিজরী। প্রথমে কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। শাবান মাসের ফজিলত সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। এ দিন দরবারে মাওলানা শামসুদ্দিন এহ্ইয়া, মাওলানা ফখরুদ্দীন যারাদী, মাওলানা বুরহানুদ্দীন গরীব ও অন্যান্য সূফি দরবেশ উপস্থিত ছিলেন। তিনি এরশাদ করলেন, এ মাসে যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর একবার দরূদ শরীফ পবিত্র অন্তরে পাঠ করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর আমলনামায় ১০০০টি সওয়াব বা পূণ্য সন্নিবেশিত করেন এবং হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকেন।

এরপর বললেন, যে শবে বরাতের রাতে কিছু সংখ্যক লোক ব্যতীত সকল মো'মেনদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমা করে দিবেন। যারা এই ক্ষমার মধ্যে পড়বে না তারা হচ্ছে–

১। যারা পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়।

২। যারা যাদুটোনা করে।

৩। যারা শরাবী অর্থাৎ মদখোর।

৪। যারা নির্দয় ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির।

৫। যারা নামাজ ত্যাগ করেছে।

৬। যারা যেনা করে অর্থাৎ অবৈধ যৌন সঙ্গমে অভ্যস্থ।

৭। সমকামিতা।

৮। মিথ্যাবাদীও প্রতারক।

৯। চোগলখুর ও গীবতকারী।

প্রত্যেকের উচিত এরাতে অন্যান্য সমস্ত কাজকর্ম হতে বিরত থেকে ইবাদত বন্দেগীতে লেগে থাকা এবং অন্যান্যকেও এ রাতে বন্দেগী করার জন্য উৎসাহিত করা। কেননা এ রাত সাধারণ ক্ষমার রাত। যারা এ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত-বন্দেগীতে থাকে তাদের উপর আল্লাহ্র রহমত সকাল পর্যন্ত বর্ষিত হতে থাকে।

শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন–

(১) সামা (বিশুদ্ধ গান) অন্তরে শান্তি দান করে, প্রেমিকদেরকে গতিশীল করে ও প্রেম-সমুদ্রে সাঁতার কাটা শিখায়।

(২) যে পর্যন্ত আল্লাহ্কে চেনা না যায় সে পর্যন্ত তাঁর ইবাদত বন্দেগীতে মজা পাওয়া যায় না।

(৩) পীরকে এমন ক্ষমতাবান ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া দরকার, যখন কোন ব্যক্তি মুরীদ হওয়ার জন্য আসে তখন সে পীর একটি মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে তার অন্তরের সমস্ত দুনিয়াবী প্রেম ও আবর্জনা এমনভাবে বের করে দিবে যেন তাঁর অন্তর স্বচ্ছ আয়নার মতো হয়ে যায়। যদি তার মাঝে এমন ক্ষমতা না থাকে তাহলে তার মুরীদ করা উচিত নয়। যদি করে তাহলে অপরকে বিভ্রান্ত করার অপরাধে অপরাধী হবে।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো আরিফদের সম্বন্ধে। তিনি বললেন, খাজা মনসুর ইমাদ বলেছেন আরিফদের জন্য তিন ধরনের নফ্স রয়েছে–(১) দুনিয়ার জীবন, (২) আলমে বরযখ, (৩) জান্নাতী জীবন। প্রথম নফ্স দুনিয়ার উপরে জয়ী হওয়া। দ্বিতীয় নফ্স আলমে বরযখে জয়ী হওয়া। তৃতীয় নফ্স বেহেস্তে শেষ সময় পর্যন্ত মোসাহিব থাকা ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اَمْوَاتًا ـ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ـ

এরপর বললেন খাজা মনসুর ইমাদ এও বলেছেন যে আরিফ স্বয়ং চার বস্তুর মধ্যে মিশ্রিত থাকে, আব (পানি,) আতশ (অগ্নি) খাক (মাটি) বাদ (বায়ু)। বাদ ও আব দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সমস্ত অসন্তুষ্টিকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এবং কোন দুনিয়াবী বস্তুকে প্রশ্রয় না দেয়া। কেননা বায়ুর কাজ হচ্ছে উড়ানো এবং পানির কাজ হচ্ছে ছাফ করা। মাটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যে কাজ তাকে দেয়া হয় তার অধিক করা, কম নয়। আর আগুন দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সমস্ত বস্তু যা তার মধ্যে ঢালা হয়, তাকে জ্বালিয়ে নির্মূল করা কিন্তু নিজে জ্বলবে না এর মধ্যে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো– عَلَيْكَ مَرُّ حَبَابِهِمْ مِنْ شَىْءٍ - এ বাক্য কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তিনি বললেন এ বাক্য আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্বন্ধে বলা হয়েছে অর্থাৎ হে মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) যে শরাহ ও শরীয়তের বোঝা তোমাকে দেয়া হয়েছে তার হিসাব তোমার দায়িত্বে। আর যে ব্যক্তি তরিকত ও হকিকতের বোঝা উঠাবে তা আমার জিম্মায় থাকবে। তার হিসাব আমি করব এবং তার পুরস্কারও আমি নিজে প্রদান করবো। তাঁর বক্তব্যের মাঝে তাঁর এক মুরিদ মানুষের পারিবারিক ঘরের খরচ সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বললেন এ প্রশ্ন করা ঠিক নয়। তুমি তোমার পরিবারের জন্য যা কিছু খরচ কর তার হিসাব তোমার নিকট হতে নেয়া হবে না। এটাও মনে রখতে হবে, যে স্বামী-স্ত্রীর প্রতি সহনশীল থাকবে এবং তাকে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট দিবে না। আল্লাহর কালামে বর্ণিত আছে।

وَاللّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ -

স্ত্রীর উচিত তার স্বামীর মালের হেফাজত করা এবং স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে তার মাল অন্যকে না দেয়া এবং লুকিয়ে না রাখা। স্বামীর সম্মুখে বিনয়ী থাকা এবং এটা শরীয়তের হুকুম। স্বামীর খেদমত করা প্রত্যেক স্ত্রীর কর্তব্য এবং যেসব স্ত্রীলোক শরীয়ত অনুযায়ী স্বামীর খেদমত করবে তার সম্পর্ক উম্মুল মোমেনীন হযরত ফাতেমাতুয্‌যোহ্‌রা রাদিআল্লাহ আনহুমার সঙ্গে হবে এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাকে শাফায়াত করবেন।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো ইনছাফ সম্বন্ধে। তিনি বললেন, এক রাতে সুলতান মাহমুদ গজনবী আনারুল্লাহর ঘুম আস্‌ছিলোনা। তিনি বিছানায় ঘুমোবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তাঁর ঘুম না আসার কারণ খুঁজতে লাগলেন। তিনি তাঁর খাদেমকে ডেকে বললেন, খোঁজ নিয়ে দেখতো কোন লোক সদর দরজায় কোন কিছুর প্রয়োজনে অপেক্ষা করছে কিনা? ভৃত্য সদর দরজায় যেয়ে দেখলো সেখানে কোন লোক নেই। সে ফিরে এসে বললো বাইরে কোন লোকের সাক্ষাৎ পেলাম না। সুলতানের এতেও সন্দেহ দূর হলো না। তিনি স্বয়ং বাইরে গেলেন এবং দেখলেন সেখানে কেউ নেই। প্রধান দরজার অদূরে একটি মসজিদ ছিলো। তিনি সেখানে গমন করলেন এবং দেখলেন মসজিদে এক ব্যক্তি সেজদাবনত হয়ে আছে। তিনি লোকটির নিকটে পৌঁছলে শুনতে পেলেন, সে সেজদায় বলছে, 'ইয়া ইলাহী তুমি সুলতান মাহমুদের সঙ্গে আমার ইনসাফের ব্যাপারটা ফয়সালা করে দাও।' সুলতান তার কথা শ্রবণ করে অবাক হয়ে গেলো এবং তাকে বললেন,

তুমি কোন্ দিন আমার নিকট কোন্ অভিযোগ নিয়ে এসেছিলে যে আমি তার ইনসাফ করিনি? তুমি বল আমি কিভাবে তোমার সাথে ইনসাফ করবো। লোকটি বললো আমি আপনার নিকট আসিনি একথা সত্যি কারণ আপনার নিকট পৌঁছার যোগ্যতা আমার নেই। আমি দরিদ্র এবং এ দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি আমার বাড়ী এসে আমাকে ধমকি দেয়, আমার স্ত্রীকে উত্ত্যক্ত করে এবং অশালীন আচরণ করে। কিন্তু আমার এমন কোন শক্তি ও সামর্থ নেই যে তার প্রতিবাদ করবো। তাইতো আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছি, আল্লাহ তুমি সুলতানকে দিয়ে আমার ইনসাফ করাও। সুলতান মাহমুদ রহমতুল্লাহি আলাইহি তার সমস্ত কথা শ্রবণ করে তাকে বললেন পুনরায় লোকটি যখন তোমর বাড়ি আসবে তখন আমাকে খবর দিবে। লোকটি আশ্বস্ত হয়ে চলে গেলো। তিন দিনের মাথায় সেই ক্ষমতাবান লোকটি রাত্রিকালীন সময়ে গরীব লোকটির গৃহে প্রবেশ করে হাঙ্গামা শুরু করলো। গরীব লোকটি দৌড়ে যেয়ে সুলতান (বাদশাহ)-কে সংবাদ দিয়েই ফিরে এলো। সুলতান মাহমুদ গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহি সংবাদ পেয়েই গরীব লোকটির গৃহে আগমন করলেন। প্রথমে তিনি পরিস্থিতি বুঝার চেষ্টা করলেন এবং অভিযোগের সত্যতা যচাই করলেন। তৎপর গরীব লোকটিকে তাঁর আগমনের কথা জানিয়ে ঘরের বাতি নির্বাপিত করতে বললেন। লোকটি তাঁর আদেশ পালন করলো। বাদশাহ সেই প্রভাবশালী লোকটিকে পরাস্ত করে হত্যা করলেন। লোকটি নিহত হয়েছে বুঝতে পেরে গরীব লোকটিকে ঘরের বাতি জ্বালাতে বললেন। ঘরের বাতি জ্বলে উঠলো। তিনি নিহত ব্যক্তির লাশটি ভালভাবে দেখলেন। তারপর গৃহের মালিককে বললেন। ঘরে কোন খাবার আছে? উত্তরে লোকটি বললো দু'টি বাসি রুটি আছে, যা আপনার খাওয়ার যোগ্য নয়। বাদশাহ বললেন, একটি রুটীর অর্ধেক আমাকে দাও। রুটী আনীত হলে তিনি খেলেন এবং খেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। গৃহস্বামী তাঁর এসব অদ্ভুত আচণের কারণ জিজ্ঞেস না করে পারলো না। তার প্রশ্নের উত্তর সুলতান মাহ্মুদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আমার আচরণে তুমি বিস্মিত হয়েছো এবং হওয়ারই কথা। আসলে আমার ভয় ছিলো যে, যে লোকটি তোমার ঘরে হাঙ্গামা রচনা করেছে হয়তো আমার পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ হতে পারে, আমার আত্মীয়ের মধ্য হতে কেউ হতে পারে এবং তাকে দেখার পর তার জন্য আমার করুণা হতে পারে, যার ফলে আমি আমার কর্তব্য 'ইনসাফ' হতে না বিচ্যুৎ হয়ে পড়ি। যার জন্য

তোমার বাড়ীতে প্রবেশ করে প্রথমেই তোমার ঘরের বাতি নির্বাপিত করতে বলি। দ্বিতীয় যখন বুঝলাম লোকটির মৃত্যু সম্পূর্ণ হয়েছে তখন বাতি জ্বালাতে বললাম এবং লোকটিকে দেখে নিশ্চিত হলাম, আমার সন্দেহ সঠিক ছিলো না। তৃতীয়তঃ যে দিন তুমি আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনার মাধ্যমে আমার কাছে 'ইনসাফ' চেয়েছিলে আমি সেদিন ওয়াদা করেছিলাম তোমাকে 'ইনসাফ' না দেয়া পর্যন্ত আহার গ্রহণ করবো না। তাই তোমার কাজ শেষ হওয়ার পর আহার করাটাও ওয়াজিবের মধ্যে ছিলো। আমার বিশ্বাস তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছো। হযরত যিকরুল্লাহ বিল খায়েরের চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন ইনসাফের হক এভাবেই আদায় হয়, এ সময় নামাজের জন্য আজান আরম্ভ হলো এবং মসলিস বরখাস্ত হলো।

–আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

ষোড়শ মজলিস

সোমবার, ৫ই রমজান ৬৯০ হিজরী। হযরতকে কদমবুসি করে সৌভাগ্যবান হলাম। এদিন পবিত্র মজলিসে মাওলানা শামস্‌উদ্দিন এহইয়া, মাওলানা ফখরুদ্দিন জারাদি, মাওলানা বোরহানউদ্দিন গরীব এবং আরো অনেক পরিচিত অপরিচিত বন্ধু বান্ধব খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শুরু হলো রমজান মাসের ফজিলত এবং আম্বিয়া ও আউলিয়াদের সম্বন্ধে। এ সময় শায়খ উসমান ছিয়াহ, শায়খ হোসাইন বিনিয়া এবং শায়খুল ইসলাম কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবার হতে চারজন নফর দরবেশ আগমন করে মজলিসে স্থান নিলেন। হযরত বললেন, রমজান মাসে সব সময়েই গোনাহগারগণ দোজখের অগ্নি হতে নাজাত পেতে থাকে। এরপর বলেলেন যখন কেউ তারাবী নামাজ পাঠ শেষ করে তখন আল্লাহ তায়লা এক হাজার ফেরেস্তাকে হুকুম দেন রহমতের তবক তার উপর বর্ষণ করার জন্য। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তারাবী নামাজ পাঠকারী ব্যক্তি গোনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র হয় যেন সে এইমাত্র মাতৃজঠর হতে ভূমিষ্ট হলো। এ ছাড়াও তার আমলনামায় হাজার হাজার সওয়াব লিখা হয়। এ নামাজের মধ্যে যে সব সূরা সে পাঠ করবে সে সব সূরার মধ্যে যতগুলো অক্ষর থাকবে তদনুযায়ী সে আল্লাহর বিশেষ রহমত লাভ করবে। এবং প্রত্যেক রাকাত নামাজের জন্য সে বিশেষ উন্নতির মাধ্যমে পুরস্কৃত হবে। এরপর বললেন, হে দরবেশগণ সমস্ত মুসলমানের উচিত এ মাসকে অতি সম্মানিত ও ঐশ্বর্যপূর্ণ মনে করা, আল্লাহর জেকেরে মশগুল থাকা এবং অধিক সময় কোরআন মজিদ তেলাওয়াত করা। এ মাসে কোরআন তেলাওয়াতের সওয়াব প্রত্যেক অক্ষরের জন্য একটি গোলাম আজাদের সমান। এরপর বললেন, হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা কুফী রহমতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র রমজান মাসে প্রতিদিন দু'বার কোরআন শরীফ খতম করতেন। এরপর বললেন হযরত খাজা মওদুদ চিস্তী রহমতুল্লাহি আলাইহি রমজান মাসের অজিফার মধ্যে ছিল প্রতিদিন চারবার কোরআন শরীফ খতম করা। এবং আরো চার সিপারাহ অধিক পাঠ করতেন। এ হিসাবে তিনি রমজান মাসে একশত বিশ/বাইশ বার কোরআন খতম করতেন।

এরপর বললেন, এরূপ মুজাহিদা ও রিয়াজাত অন্য কিছুতে হতে পারে না। শায়খে শায়ূখ, শায়খ কবির কুদ্দিসাল্লাহ সিররুহুল আজীজ-এর রীতি ছিল রমজান মাসের প্রতিদিনে কোরআন শরীফ খতম করতেন এবং শেষ বয়স পর্যন্ত এভাবেই চলেছেন। এরপর হযরত শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর্ রহমতুল্লাহি আলাইহির একটা ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে বললেন যে, তিনি একবার সফরে (ভ্রমণ) কিরমান শহরে হযরত শায়খ আহাদুদ্দিন কিরমানী রহমতুল্লাহি আলাইহির সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁর সঙ্গে কয়েকদিন অতিবাহিত করেছেন। এর মধ্যে একদিন তারা এক জামাতখানার চত্তরে বসেছিলেন, এমন সময় সেখানে আল্লাহর নিয়ামত ও হালপ্রাপ্ত চারজন দরবেশ উপস্থিত হলেন। সালাম দোয়া ও মুসাফার পর সেখানে বসে কারামত সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, আমাদের মধ্যে কারামতের অধিকারী যিনি তিনি কারামত দেখান। অন্যরা সকলেই শায়খ আহাদুদ্দিন কিরমানী রহমতুল্লাহি আলাইহির দিকে ইশারা করলেন। যেহেতু তিনি এখানকার মালিক তাই তাঁর মধ্যে দিয়েই কারামত প্রদর্শন শুরু হোক। সকলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হরযত শায়খ আহাদুদ্দিন কিরমানী রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন এ শহরের মালিক আমার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করে। আজ সে মাঠে পলো খেলার জন্য গমন করেছে আমি চাই সে জীবিত না ফিরে আসুক। একটু পরেই তার এক মুরীদ এসে খবর দিলো, এ শহরের মালিক পলো খেলার মাঠে ঘোড়া থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

দরবেশগণ দন্ডায়মান হয়ে তাঁর এ কারামতের স্বীকৃতি দিলেন। এরপর আমার দিকে (শায়খ ফরিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি) সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন এবার আপনি কিছু প্রদর্শন করুন। আমি তাঁদেরকে চোখ বন্ধ করতে বললাম। তারা চোখ বন্ধ করলো। এরপর আমি বললাম চোখ খুলুন। তাঁরা চোখ খুলে দেখলো আমরা সকলেই কাবাঘরে উপস্থিত আছি। সাথে সাথে তাঁরা বলে উঠলো তাসাউওফের বীর পুরুষ একেই বলে। এ ঘটনা বলতে বলতে হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়েরের চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন আমরা জানতাম আমার শায়খ হযরত ফরিদউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রতিদিন ফজর ও এশার নামায কাবা শরীফে পড়তেন। এরপর বললেন, আমার শায়খ ও হযরত জালালুদ্দিন আউচী রহমতুল্লাহি আলাইহি এক সঙ্গে বসেছিলেন। এমন সময় একজন দরবেশ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললো, আমাকে কিছু দধি

প্রদান করুন আমি খাব। আমার মুর্শেদ হযরত জালালুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির দিকে লক্ষ্য করে বললেন দরবেশকে বলে দিন সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দই নিয়ে আসুক সেখানে তার জন্য দই রাখা আছে। কিন্তু সম্মুখের স্থানটি ছিলো পানিতে ভর্তি সেখানে দই থাকার কোন সম্ভাবনাই ছিলনা, দরবেশ তাঁর কথা পালন করে সেখানে গমন করে দেখলো সব পানি দধিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এ সময় হাসান কাওয়াল উপস্থিত হলে তিনি তাকে কাওয়ালী পেশ করার জন্য অনুমতি দিলেন। রাগ শুরু হলো 'সামার' কথার ভাবের মধ্যে সকলেই তলিয়ে যেতে লাগলেন। বিশেষভাবে হযরত ওসমান সিয়াহ রহমতুল্লাহি আলাইহি এভাবে ঐশী অচৈতন্যলোকে গমন করলেন যে তাঁর নিজের সত্ত্বাও রইলো না। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরলো তখন তাকে খাছ পোষাক প্রদান করা হলো। এবং আমি অধমকে দিলেন পাগড়ী। এ দিনটি ছিলো যেন রহমতে পরিপূর্ণ।

এরপর বললেন হাজার বছর ইবাদতের চেয়ে আম্বিয়া আউলিয়াদের বন্ধুত্বপূর্ণ সঙ্গ উত্তম। এ পথের বীরদের উচিত হামেশা নিজের সময়কে তাদের স্মরণে অতিবাহিত করা। এরপর বললেন সেই কৃপণ কারুণের কথা যখন জমিন তাকে গ্রাস করছিলো এবং সে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছিলো, মাটির গভীরে পৌছার পর সেখানকার বাসিন্দারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কার কওমের (গোত্র) লোক এবং তোমার এ সাজা কেন? কারুণ বললো আমি হযরত মূসা আলাইহিস্ সালমের কাওমের লোক তার মুখ দিয়ে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নাম বেরুবার সাথে সাথে মূর্তিকার প্রতি আল্লাহ তায়ালার ফরমান এলো, 'কারুণ আমার বন্ধুর নাম সম্মানের সঙ্গে নিয়েছে, অতএব তাকে আর গ্রাস করো না।' এ কথা বলতে বলতে হযরত খাজা কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন পাপীদের অন্তর এজন্য উৎসাহবোধ করে যেন দুশমন আল্লাহ তায়ালার বন্ধুর নাম নিলে শাস্তি লাঘব হয়। যিনি আজীবন বন্ধুর স্মরণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে, তাঁর খুশীতে খুশী হয়েছে, তাঁর নাম যদি কোন পাপী সম্মানের সাথে নেয় তাহলে তার শাস্তি লাঘব হবে না কেন? মাফ হবে না কেন? এবং সে কেন দোযখে জ্বলবে? এরপর বললেন হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে–

مُحَبَّتُ الْاَنْبِيَاءِ عِبَادَةُ سِتِّيْنَ سَنَةً ـ

অর্থাৎ আম্বিয়াদের সাথে এক মূহূর্তের বন্ধুত্ব ষাট বছর বন্দেগীর সমান। এর পর বললেন যে খাজা আবু আলী দিকাক রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যারা

আম্বিয়াদেরকে অধিক স্মরণ করে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য ফেরেস্তাদেরকে হুকুম দেন নূর বর্ষণ করার জন্য যাতে তাদের আপাদমস্তক নূরায়িত হয়। এরপর বললেন, হাকিম লোকমান রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, যে ব্যাক্তি আম্বিয়া ও আউলিয়াদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে এবং তাঁদের স্মরণ করে, তার জন্য আল্লাহ তায়ালা আসমান জমিনের ফেরেস্তাদেরকে হুকুম দেন, তাদের আমলনামা হতে সমস্ত পাপ মুছে ফেলতে এবং আমলনামার খালি স্থানসমূহ নেকিতে ভরে দিতে। এমন লোকেরা বেহেস্ত হতেও উচ্চ মাকাম বা মর্যাদা লাভ করবে। তিনি এ আলোচনা করতে করতে ঐশী-অচৈতন্য লোকে গমন করলেন। মজলিস নিস্তব্ধ হলো।

–আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

সপ্তদশ মজলিস

শনিবার, ৫ই মহর্‌রম, ৬৯১ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। আলোচনা চলছিলো মহর্‌রম মাসের ফজিলত ও হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইন আলাইহিস্ সালাম সম্বন্ধে। এ দিন মজলিসে মাওলানা শামসুদ্দিন এহ্ইয়া, মাওলানা ফখরুদ্দিন জারাদী, মাওলানা বুরহানুদ্দিন গরীব ও শায়খ নাছিরুদ্দীন মাহমুদ রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং অন্যান্য সূফি দরবেশ হযরত খাজা যিকরুল্লাহ্‌র খেদমতে হাজির ছিলেন। হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের বললেন যে এ মাস হচ্ছে হযরত শায়খে শায়খুল আলম-এর দুনিয়া হতে স্থানান্তর হওয়ার মাস, দুনিয়া হতে বিদায়ের মাস। যে রাতে তিনি দেহ ত্যাগ করবেন সে রাতে তিনি তিনবার এশার নামাজ পড়লেন এবং প্রতিবারই বললেন এ নামাজ পড়ার আর সৌভাগ্য হবে কিনা! এরপর বললেন হযরত শায়খে শায়খুল আলমের বেছাল (মৃত্যু) ছেজদার মধ্যে হয়েছে এবং যে সময় তাঁর ইন্তেকাল হলো সে সময় আসমান হতে আওয়াজ হলো মাওলানা ফরিদউদ্দিন দুনিয়া ত্যাগ করলেন এবং নৈকট্যের আরো উচ্চতর মাকামে দাখিল হলেন। হযরত এ ঘটনা বর্ণনা করছিলেন আর কাঁদতেছিলেন। যখন তিনি 'ইন্তিকাল' শব্দটি উচ্চারণ করলেন তখন চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন। তাঁর এ বেদনায় সকলের চোখ দিয়েই অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো। হযরতের যখন হুস ফিরলো তখন বলতে লাগলেন হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি আশুরার দিন সাত প্রকারের খাদ্য তৈরী করে বিতরণ করবে, প্রতিটি দানার জন্য নেকি লিখা হবে এবং সেই অনুপাতে পাপ মোচন হবে। আর যে ব্যক্তি আশুরার দিন রোজা রাখবে তার আমলনামায় এক বছরের নফল ইবাদতের ছওয়াব লিখা হবে। পরের আলোচনা ছিলো খাতুনে কিয়ামত বিবি ফাতেমাতুয্ যোহরা রাদিআল্লাহু আন্‌হা সম্বন্ধে। হযরত বললেন যে রাতে বিবি ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহা মাতৃগর্ভে প্রবেশ করবেন তার একদিন পূর্বে হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম একটি বেহেস্তের আপেল এনে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন এ আপেলটি আপনি একা খাবেন অন্য কাউকে এর ভাগ দিবেন না। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিব্রীল আমিনের কথা রক্ষা করেছিলেন। সেই রাত্রেই উম্মুল মো'মেনিন হযরত

খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহার গর্ভে হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহার দেহ তৈরী শুরু হয়। এরপর হযরত বললেন বিবি ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহার পরবর্তী ঘটনা সকলেরই জানা আছে। তাঁর নয়নমনি কলিজার ধন কারবালাতে কিভাবে অনাহারে ও পিপাসার্ত অবস্থায় জালেমদের হাতে শহীদ হয়েছেন তাও আপনারা জানেন। এরপর বললেন আমি 'ছির' কিতাবে লিখা দেখেছি যে শিশুকালে আমিরুল মোমেনিন হযরত হাসান ও হুসাইন আলাইহিস্ সালাম যখন দোলনার মধ্যে কাঁদতেন এবং বিবি ফাতিমা রাদিআল্লাহু আন্হা কাজে ব্যস্ত থাকতেন তখন জিব্রীল আলাইহিস্ সাল্লাম এর প্রতি আল্লাহ্র হুকুম হতো তুমি ফাতিমা রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর ঘরে যাও এবং সাহেব জাদাদের দোলনা দোলাও যাতে তারা আরামে ঘুমুতে পারে। আদেশ মাত্র হযরত জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম হুকুম পালনে কর্মতৎপর হয়ে উঠতো। এরপর বললেন হযরত ইমাম হুসাইন আলাইহিস্ সালামের শাহাদতের দিন সমস্ত আভ্যন্তরীণ জগতে অমানিশার কালো ছায়া নেমে এসেছিলো। আকাশে ঘনঘটা, বিদ্যুতের মাতম, গজবের ফেরেস্তারা দরবারে এলাহীতে সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান শুধু হুকুমের অপেক্ষা। আদেশ পেলেই শত্রু বাহিনীকে সমুলে বিনাশ করে দিবে। কিন্তু ইলাহির ইচ্ছা ছিলো অন্যরূপ। তিনিই ফেরেস্তাদের বললেন তোমরা শান্ত হও নিশ্চুপ হও-প্রেমের খেলা অবলোকন কর, এরা আমর প্রিয়, অতি আপন, প্রকৃত বন্ধু। তোমরা অপেক্ষা কর এবং দেখ আশেক মাশুকের খেলা। আজকের ঘটনার শেষ হবে কিয়ামতের দিন। সেদিন হযরত হুসাইন আলাইহিস্ সালাম জালেমদের পরিণতি যেভাবে চাইবেন সেভাবেই ইন্সাফ হবে। এ ঘটনা বলতে বলতে হযরত যিকরুল্লাহ বিল খায়ের কাঁদতে লাগলেন। মজলিসের অবস্থা স্বাভাবিক হলে তিনি বলতে লাগলেন কি আশ্চর্য ঘটনাই না সেদিন কিয়ামতের মাঠে ঘটবে পবিত্র খান্দানের পবিত্র সন্তান হযরত ইমাম হুসাইন আলাইহিস্ সালাম তাঁর শত্রুদের তিনি মাফ করে দিবেন এবং নাজাতের জন্যও সুপারিশ করবেন। কিন্তু সেই ইসলামের দুশমন এজিদ বাহিনী সেদিন নাজাত পাবে না। তারা দোজখের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে। তাদের মুক্তির সম্ভাবনা আমি দেখছিনা। এরপর বললেন কিয়ামতের দিন কারবালার ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত জালেম ও ইসলামের দুশমনদেরকে হযরত ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহার সম্মুখে হাজির করা

হবে এবং তাঁকে এদের বিচার করতে বলা হবে। কিন্তু না সে মহাজননী সেদিন জালেমদের বিচার করবেন না বরং মাফ করে দিবেন। এতো গেলো মহান হৃদয়ের মহান কথা "প্রতিশোধ নয় ক্ষমা"। কিন্তু আল্লাহর আইন আছে, বিধান আছে নীতি আছে কারবালার শহীদানের রক্ত কি বৃথা যাবে? না যাবে না আল্লাহ্তায়ালার ভাবগম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসবে এই ফাতিমা রাদিআল্লাহু আন্হু আমি তোমার প্রার্থনা কবুল করে শহীদানে কারবালার রক্তের বিনিময়ে আমি তোমার পিতার সমস্ত গোনাহ্গার উম্মতদেরকে মাফ করে দিলাম।' ইলাহীর এ আওয়াজ শুনে মা ফাতেমা রাদিআল্লাহু আন্হু আস্বস্ত হলেন তার মন আনন্দে ভরে উঠল। কিয়ামতের ময়দান হতে বিষাদের ছায়া সরে যেয়ে খুশীর হিল্লোল বইবে। হযরত রেছালতে পানাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র চেহারা মোবারক আনন্দোজ্বল দেখাবে।

এরপর হযরত বললেন, আজ আমার মুর্শেদ হযরত শায়খে শায়খুল আলম ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর্ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর পবিত্র উরস। খানা ও হালুয়া মওজুদ আছে গরীব ও মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দাও এবং মজলিসের মেহমানদেরও খেতে দাও। আদেশ হওয়া মাত্র তা পালন করা হলো। উরস এক দিবস ও এক রাত স্থায়ী ছিলো। খাওয়া-দাওয়ার পর সামার মজলিস শুরু হলো। হযরত খাজা ও দরবেশগণ ইশকের হালে অবগাহন করে ঐশী-অচৈতন্যলোক গমন করলেন। নিজেদের সম্বন্ধে কারও কোনরূপ চৈতন্য ছিলো না। চব্বিশ ঘন্টা পর আস্তে আস্তে সকলের হুশ ফিরতে লাগলো।

নিম্নোক্ত গজলটি গাওয়া হয়েছিলো।

تر ا سماع بنا شد جو سوز عشق نبود

گمان مبر که برآیدز خام هر گزدود

چوہر چه میر وداز دست دوست فر قے نیست

میان شربت نو شین وتیغ زبر آلود -

উচ্চারণ ঃ তেরা সামা বিনা শুদ জো সুজে ইশকে না বুদ
গোমান মোবারাকে বর আয়িদ যোখাম হরগিজ দুদ
চু হরচা মীর ও দাজ দস্তে দোস্ত ফিরকে নীস্ত
মিয়ান শরবতে নওশীন ও তেগ যহের আলোদ

অর্থ ঃ তোমার গানের ভীত হলো শুরু যা প্রেমের জ্বালাকে করবে অস্তিত্বহীন
নিস্কৃতি পাবে তুমি জখম হবে একেবারে অচিন

যদি মুহাব্বাতের সব প্রধান কর্মগুলি হয় বন্ধুর হাতে তাহলে ভয় নেই শরবত পানকারী যদি হয় তরবারির খাপ তাহলে জহর হবে তরোবারী।

মজলিসের মেহমানগণ হযরতকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিতে লাগলো এক সময় খানকার লোক ছাড়া অন্যরা সবই চলে গেল। মজলিস সমাপ্ত হলো।

–আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

আমাদের পরবর্তী কিতাব ঃ

- খাজা গরীব নওয়াজের পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য কুতুবুল মাশায়েখ মুঈনুদ্দিন (রহঃ)
- মকতুবাতে খাজা গরীব নওয়াজ
- দিওয়ান-ই-গরীব নওয়াজ
- খায়রুল মাজালিস